HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪– বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা

টপিক – ০১ নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

টপিক ০২: বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক

টপিক ০৩: বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক

টপিক ০৪: এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

টপিক ০৫: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০৬: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর ধারণা

নৃগোষ্ঠী বলতে মানবজাতির এমন একটি উপবিভাগকে বোঝায় যারা কিছু অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। নৃগোষ্ঠীর সর্বাধিক স্বীকৃত ইংরেজি পরিভাষা হলো 'Race' (রেস)। বাঙালি, ইংরেজ, জাপানি ইত্যাদি হলো জাতি। অপরদিকে মঙ্গোলয়েড, নিগ্রোয়েড ইত্যাদি হলো নৃগোষ্ঠী। এ কারণেই বলা যায়, জাতি গঠনে যেসব উপাদান দায়ী তার মধ্যে নৃগোষ্ঠী অন্যতম। নৃগোষ্ঠী ও জাতি আলাদা দুটি বিষয়। নৃগোষ্ঠী জাতি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

নৃগোষ্ঠী মূলত একই বংশজাত মানবগোষ্ঠী যারা উত্তরাধিকারসূত্রে একই দৈহিক আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। নৃবিজ্ঞানীরা নৃগোষ্ঠীর ধারণাকে এভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অর্থাৎ নৃগোষ্ঠী হলো একই বংশজাত মানবগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে দৈহিক আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বেশকিছু মিল পরিলক্ষিত হয়।

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর ধারণা

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত নৃগোষ্ঠীর কতিপয় সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হলো- Introduction to Sociology গ্রন্থে নৃগোষ্ঠী বা Race-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- "A race is a human population that is believed to be distinct in some way from other human based on real or imagined physical differences". অর্থাৎ, একটি নৃগোষ্ঠী হলো একটি মানব জনগোষ্ঠী যারা বিশ্বাস করে যে, তারা অন্যান্য মানবগোষ্ঠী থেকে বাস্তবিক অথবা কল্পিত শারীরিক ভিন্নতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র।

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী Schaefer তার 'Sociology' গ্রন্থে নৃগোষ্ঠী (Race)-এর সংজ্ঞায় বলেন, "Race is a group which is set apart from others because of obvious physical difference." অর্থাৎ, নৃগোষ্ঠী হলো একটি দল যারা অন্যদের থেকে আবশ্যিক শারীরিক ভিন্নতার জন্য আলাদা।

Lan F. Haney Lopez নৃগোষ্ঠী (Race)-এর সংজ্ঞায় বলেন, "When some people use the 'race' they attach a biological meaning, still others use 'race' as a socially constructed concept. It is clear that even though race does not have a biological meaning, it does have a social meaning which has been legally constructed." অর্থাৎ, যখন কিছু মানুষ 'নৃগোষ্ঠী' শব্দটি ব্যবহার করে তারা একটি জৈবিক অর্থ সংযুক্ত করে তথাপি অন্যরা 'নৃগোষ্ঠী' শব্দটি ব্যবহার করে সামাজিকভাবে নির্মিত ধারণা হিসেবে। এটি স্পষ্ট যে, যদিও নৃগোষ্ঠীর কোনো জৈবিক অর্থ নেই, এর রয়েছে সামাজিক অর্থ যা বৈধভাবে নির্মিত।

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী Jhon M. Shepard তার 'Sociology' গ্রন্থে নৃগোষ্ঠী (Race)-এর সংজ্ঞায় বলেন, "Race is a distinct category of people who share certain biologically inherited physical characteristics." অর্থাৎ, নৃগোষ্ঠী হলো একটি পৃথক জনসংখ্যার শ্রেণি যারা নির্দিষ্ট সংখ্যক দৈহিক বৈশিষ্ট্য জৈবিকভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে তা ধারণ করে।

E. B. Tylor তার "Dictionary of Anthropology'-তে নৃগোষ্ঠী (Race)-এর সংজ্ঞায় বলেন, "Race is a major division of mankind, with a distinctive, hereditarily transmittable physical characteristics." অর্থাৎ, নৃগোষ্ঠী হলো মানবজাতির একটি প্রধান বিভাগ যাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক এবং বংশগতিতে বহনযোগী দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে।

তাই উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি, নৃগোষ্ঠী হলো এমন একটি নির্দিষ্ট মানব সম্প্রদায় যারা বংশপরম্পরায় কিছু সাধারণ ও অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে।

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর ধারণা

কোনো বিষয়ের প্রকৃতি বলতে উক্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ বা পরিচয়কে বোঝায়। ক্ষুদ্র জাতি সত্তা হিসেবে নৃগোষ্ঠী বিষয়টিরও বেশকিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এর সংজ্ঞাসমূহের মাঝেও প্রতিফলিত হয়। তবে নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলাদাভাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালানো জরুরি। কেননা এর দ্বারাই নৃগোষ্ঠীর প্রকৃতি নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

এ উদ্দেশ্যে নৃগোষ্ঠীর প্রকৃতি তথা এর বৈশিষ্ট্য নিচে উপস্থাপিত হলো-

নৃগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয় সাদৃশ্যপূর্ণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যগুলো প্রধানভাবে লক্ষণীয়। দেহের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিত্তিতে দৈহিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- মাথা ও মুখের আকৃতি, ঠোঁট, নাকের গড়ন, ত্বক, চোখ, চুলের রং, গায়ের রং, কান, উচ্চতা, ওজন, লোম ইত্যাদি। এসব দিক বিবেচনা করেই চিহ্নিত করা হয় অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণকারী নৃগোষ্ঠী।

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠী মূলত মানব সম্প্রদায়েরই একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি। সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে এরা স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়। আবার পৃথক পৃথক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেও একেকটি নৃগোষ্ঠী অপরাপর নৃগোষ্ঠী থেকে আলাদা হয়। ধর্ম ও নরবংশের ক্ষেত্রেও আলাদা হয়। তা সত্ত্বেও প্রতিটি নৃগোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে মানবজাতিরই একেকটি উপবিভাগ হিসেবে বিবেচিত।

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতিকে চারটি নৃগোষ্ঠীর আওতায় ফেলা হয়। আর এ চারটি বৃহৎ নৃগোষ্ঠী হলো- ১. শ্বেতকায় (Caucasoid), ২. মঙ্গোলীয় (Mongoloid), ৩. কৃষ্ণকায় (Negroid) ও ৪. অস্ট্রেলীয় (Australoid) । নিচে এদের বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো-

১. ককেশীয় বা শ্বেতকায় ককেশীয়দের বাসস্থান প্রধানত ইউরোপ, আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার কিছু অঞ্চলব্যাপী। তাদের মাথা প্রধানত লম্বাকৃতি, মুখাকৃতি সরু বা লম্বাকৃতির। এদের নাক উন্নত, চিকন, লম্বা ও সরু। ককেশীয়দের চোখের রং হালকা থেকে কালো বাদামি। ঠোঁট পাতলা এবং কান মাঝারি ধরনের। এদের অধিকাংশের গায়ের রং সাদা বা সাদা-লালচে। তবে বাদামি এবং কালো-বাদামি রঙের ককেশীয়ও দেখা যায়। ককেশীয়দের মাথার চুলের রং বাদামি বা সোনালি। মাথার চুল সরু ও মোটা উভয় রকমেরই হয়। খাড়া থেকে কোঁকড়ানো পর্যন্ত চুল লক্ষ করা যায়। ককেশীয়দের মধ্যে খর্বকায় লোক প্রায় নেই বললেই চলে। এরা দীর্ঘাঙ্গের অধিকারী। তবে উচ্চতায় অনেকেই মধ্যম।

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর প্রকৃতি

২. মঙ্গোলীয়: মধ্য, উত্তর এবং পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ মানুষ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত। মঙ্গোলীয়দের মাথার আকৃতি ককেশয়েডদের তুলনায় প্রধানত চওড়া বা গোল। তাদের মুখ ককেশীয়দের তুলনায় চওড়া এবং কিছুটা খর্বাকৃতির। মঙ্গোলীয়দের নাক ককেশয়েডদের নাকের তুলনায় কিছুটা ক্ষুদ্রাকৃতির, মোটা এবং অনুচ্চ বা অনুন্নত। তবে নিগ্রোদের নাকের তুলনায় চিকন, উন্নত এবং পাতলা। এ কারণে মঙ্গোলীয়দের নাক মধ্যমাকৃতির এবং মাঝারি বলে বর্ণনা করা হয়। মঙ্গোলীয়দের চোখের রং কালো-বাদামি থেকে শুরু করে ঘোর কালো বর্ণের হয়ে থাকে। এদের কান লম্বা এবং সরু। মঙ্গোলীয়দের গায়ের রং প্রধানত বাদামি বা হলুদ ধরনের। তাদের মাথার চুল প্রধানত কালো। চুল খাড়া, মোটা এবং দীর্ঘ। মঙ্গোলীয়রা উচ্চতায় প্রধানত মাধ্যম মানের। অনেকেই আবার খর্বাকৃতির। এদের দেহের গড়নও মোটামুটি বলিষ্ঠ।

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর প্রকৃতি

নিগ্রো বা কৃষ্ণকায়: আফ্রিকা, বিশেষত সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে এবং মেলানেশিয়ায় নিগ্রোদের প্রধান আবাসস্থল। নিগ্রোদের মাথা সাধারণত লম্বাকৃতির। নিগ্রোদের মুখ যদিও মঙ্গোলয়েডদের তুলনায় সরু ও লম্বাকৃতির তথাপি তা কখনই ককেশয়েডদের মতো অতটা সোজা, লম্বাকৃতির এবং সরু নয়। নিগ্রোদের নাকের উচ্চতা খুব কম। এদের নাক নিচু, মোটা, প্রশস্ত ও ভোঁতা। নিগ্রোদের চোখের রং কালো-বাদামি থেকে কালো হয়ে থাকে। তাদের ঠোঁট মোটা বা পুরু এবং কান ছোট ও প্রশস্ত। নিগ্রোদের চামড়ার রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। তাদের চুলের রং কালো বা কালো-বাদামি।

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর প্রকৃতি

৪. অস্ট্রালয়েড: অস্ট্রালয়েডদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার বলেছেন যে, অস্ট্রালয়েডদের মধ্যে নিগ্রো বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পায়, তবে কিছু বৈশিষ্ট্য ককেশীয়দের সঙ্গে মিলে যায়। বস্তুত অস্ট্রালয়েডদের একটি পৃথক নরগোষ্ঠী বললে ভেদ্দা, পলিনেশিয়ান এবং আইনুদেরকেও ভিন্ন ভিন্ন নরগোষ্ঠীর নাম আখ্যা দেওয়া চলে। অস্ট্রালয়েডদের গায়ের রং কালো-বাদামি। এদের মাথার চুল ঢেউ খেলানো। তাদের গায়ে লোমের প্রাচুর্য রয়েছে। এদের মাথা লম্বাকৃতির তবে নাক প্রশস্ত এবং উচ্চতায় মধ্যমাকৃতির।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। রিজলে বলেন, বাঙালিরা মঙ্গোল-দ্রাবিড় প্রভাবিত সংকর জনগোষ্ঠী। আবার নীহাররঞ্জন রায় বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদি অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড় এ দুটি নৃগোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ করেছেন।

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর প্রকৃতি

জাতি গঠনের একটি অন্যতম উপাদান হলো নৃগোষ্ঠী। জাতি গঠনে নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা বেশ সক্রিয়। নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেই ধারণা করা যায় একটি জাতি কীভাবে গঠিত হচ্ছে। আর যেকোনো জাতিই কোনো না কোনো নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে উক্ত সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এ কারণেই একটি জাতি মূলত এক বা একাধিক নৃগোষ্ঠীরই সমন্বিত রূপ।

একেকটি নৃগোষ্ঠী বংশপরম্পরায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে দৈহিক বৈশিষ্ট্য বহন করার মাধ্যমে। কিছু সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্য তারা জৈবিক কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে থাকে। একটি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের যে মিল পরিলক্ষিত হয় তার জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমাও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে Garn, Coon, Mayer প্রমুখ গবেষকগণ ভৌগোলিক নৃগোষ্ঠী প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। তাই ধারণা করা হয়, একই এলাকায় বসবাসরত হওয়ার কারণেই একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একই ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

নৃগোষ্ঠীর প্রকৃতি

একটি নৃগোষ্ঠী তাদের মধ্যে বিদ্যমান শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অভিন্নতার কারণেই অন্যান্য নৃগোষ্ঠী থেকে নিজেদের পৃথক ভাবে। এ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাদের সামাজিক আচরণ, সংস্কৃতি এবং জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারাবাহিকতার মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

একটি দেশে একের অধিক নৃগোষ্ঠীর সদস্যগণ বসবাস করতে পারে। যেমন- বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও বসবাস করে থাকে সমতল অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার চাকমা, মারমা, সাঁওতাল প্রমুখ। এদের নৃগোষ্ঠীগত সাদৃশ্য নেই।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪– বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা

টপিক – ০২ বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক

টপিক ০২: বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক

বাংলাদেশে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় তেমন সুস্পষ্ট নয়। এর পিছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। রিজ। বাঙালিদের মঙ্গোলীয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। তবে তার এ তথ্য যথেষ্ট সমালোচিতও হয়েছে। ড. নীহাররঞ্জন রায়, রমেশ চন্দ্র মজুমদার এ তথ্য গ্রহণ করেননি। আবার বিরাজ শঙ্কর গুহ এবং অতুল সুর বাঙালিকে মিশ্র জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই সকল মতবিরোধ সাপেক্ষে বাঙালিকে সংকর নরগোষ্ঠী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক

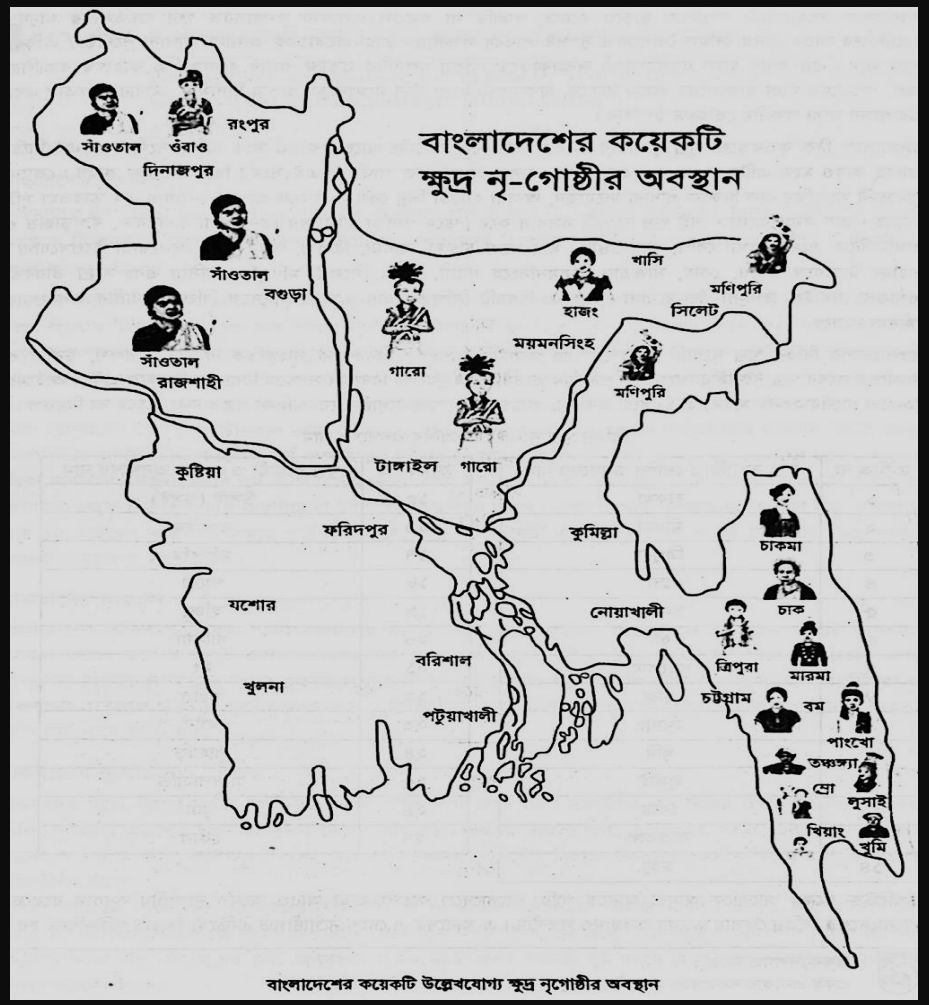

বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক

বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা ছাড়াও রয়েছে পাহাড়ি বা সমতল এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ। বাঙালিদের সাথে এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যেও সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষণীয়। তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য বহন করে। এর কারণ হলো বাংলাদেশের জনপ্রকৃতিতে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। এ কারণেই বাঙালিরা মিশ্র, গারোদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড প্রভাব রয়েছে, চাকমাদের মধ্যে চীনা মঙ্গোলয়েড প্রভাব বিদ্যমান, আবার সাঁওতাল এবং ওঁরাওদের মধ্যে লক্ষণীয় ভেড্ডিড উপাদান।

বাংলাদেশে ঠিক কতকগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে এটির সংখ্যা ৩০-এর নিচে, আবার কারও মতে এটির সংখ্যা ৪০-এর উপরে। মূলত সংস্কৃতিগত পার্থক্যই এই সংখ্যা বিভেদের মূল কারণ। কোনো নৃবিজ্ঞানী সংস্কৃতির এক দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন, অন্যরা হয়তো ভিন্ন কোনো দিককে প্রাধান্য দেওয়ায় এই তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে এদের সংখ্যা বেশি, প্রায় ১৪টি। যার মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, লুসাই, পাংখোয়া উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উত্তরবঙ্গে ওরাও, কোচ, সাঁওতাল; ময়মনসিংহে গারো, বর্মন; সিলেটে মণিপুরি, খাসিয়া এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা উল্লেখযোগ্য। তাই এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়, বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যার বসবাস রয়েছে।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইনের (২০১০ সালের ২৩নং আইন) ২(১) ধারা এবং ১৯ ধারায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ছক

বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও শ্রেণির জনগণের নাম

ক্রমিক নং	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও শ্রেণির জনগণের নাম
১	চাকমা
২	মারমা
৩	ত্রিপুরা
৪	ম্রো
৫	তঞ্চঙ্গ্যা
৬	বম
৭	পাংখোয়া
৮	চাক
৯	খিয়াং
১০	খুমি
১১	লুসাই
১২	কোচ
১৩	সাঁওতাল
১৪	ডালু

ক্রমিক নং	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও শ্রেণির জনগণের নাম
১৫	উসাই (উসুই)
১৬	রাখাইন
১৭	মণিপুরি
১৮	গারো
১৯	হাজং
২০	খাসিয়া
২১	মং
২২	ওরাঁও
২৩	বর্মন
২৪	পাহাড়ি
২৫	মালপাহাড়ি
২৬	মুণ্ডা
২৭	কোল

উপরিউক্ত ছকের আলোকে আমরা জানতে পারি, বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া আরও অনেক নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তাদের অবস্থানও লক্ষণীয়। এ কারণেই এ দেশে নৃগোষ্ঠীগত ঐতিহ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪– বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা

টপিক – ০৩ কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

টপিক ০৩: বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

চাকমা

চাকমাদের উৎপত্তি

চাকমাদের উৎপত্তিসংক্রান্ত তেমন কোনো তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাদের আবাসস্থল সম্বন্ধে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের তথ্যানুযায়ী 'চাকমা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে এভাবে- চাংমেং > চাংমে/চাংমা> চাকমা।

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, চাকমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন নিয়ে দুটি মতামত রয়েছে। চাকমাদের আদি পিতা হিসেবে 'বিজয়গিরি' নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি নিজ রাজ্য চম্পকনগর থেকে রাজ্য জয় করতে বের হন। এ চম্পকনগর রাজ্যটির অবস্থান নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন বিহারে, কেউ বলেন বার্মায়। এ 'চম্পক' শব্দ থেকে 'চাকমা' শব্দের উদ্ভব বলেও অনেক গবেষক ধারণা করেন। আবার চাকমা ছড়া সাহিত্যে চম্পকনগরের উল্লেখ না থাকলেও নূরনগরের কথা আছে। আর এ নূরনগর ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরায় অবস্থিত বলে জানা যায়।

চাকমা

তাই চাকমাদের সাথে ত্রিপুরাদের যোগসূত্র প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে। অশোক কুমার দেওয়ান তার 'চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার' গ্রন্থে বিজয়গিরির আমল চৌদ্দ শতকের পূর্বে বলে উল্লেখ করেছেন। আবার পর্তুগিজ নাবিক Joade Barros-এর ১৫৫০ সালের আঁকা মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে 'Chacomas' রাজ্যের উল্লেখ করেন। আরাকানের ইতিহাসে জানা যায়, চাকমারা আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে রাঙ্গুনিয়া বা চট্টগ্রামের কাছাকাছি আসে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা যায়, চাকমারা প্রায় ১৫ শতকের কাছাকাছি সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা তার নিকটবর্তী এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে এবং এখান থেকেই চাকমাদের উৎপত্তি হয়।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

চাকমা

চাকমাদের বসবাস

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলা- খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জুড়েই চাকমারা বসবাস করে। তবে রাঙামাটি জেলাতে চাকমাদের বসবাস সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলায় চাকমাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ভারতের মিজোরাম, আসাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশেও চাকমারা বসবাস করে থাকে। আবার মিয়ানমারেও চাকমাদের একটি শাখা রয়েছে বলে জানা যায়। যা 'দইংনাক' নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

চাকমা

চাকমাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

চাকমাদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলীয় প্রভাব অধিক লক্ষ করা যায়। সমতলের বাঙালিদের চেয়ে এ প্রভাব অনেক বেশি। পাহাড়ি অঞ্চলের চাকমারা সুঠাম দেহের অধিকারী। তাদের উচ্চতা লম্বা, মাঝারি ও খাটো তিন ধরনেরই হয়। তাদের গায়ের রং ফর্সা, নাক চ্যাপ্টা এবং চোখ ছোট। এসব বৈশিষ্ট্যের বিচারে তাদের সাথে চীনা মঙ্গোলয়েডের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত চাকমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা অত্যন্ত বর্ণিল। ২০১১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক থেকে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে চাকমারাই সর্ববৃহৎ দল। উক্ত রিপোর্ট অনুসারে জানা যায়, চাকমাদের মোট জনসংখ্যা ৪,৪৪,৭৪৮ জন। পরবর্তী দুই বছরে এ জনসংখ্যা আরও বেড়েছে যা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

চাকমা

চাকমাদের সমাজব্যবস্থা

চাকমাদের সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় তাদের সমাজের বিভিন্ন আচার-প্রথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। এক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হবে সেগুলো নিচে উপস্থাপিত হলো-

১. বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ চাকমাদের মধ্যে সাধারণভাবে নিজ বংশের সাত পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হলেও তারা এ রীতি পুরাপুরি মানে না। তাদের মধ্যে মামাতো ভাইবোন, ফুফাতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। আবার খালাতো ভাইবোনের মধ্যেও তাদের বিয়ে হয়। তবে আপন চাচাতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে হওয়াতে তাদের সামাজিক নিষেধ রয়েছে। তাদের মধ্যে বহু স্ত্রী বিবাহ, অন্তর্বিবাহ, বহির্বিবাহ ইত্যাদিও প্রচলিত রয়েছে। চাকমা যুবকরা চাকমা সমাজ এবং বাইরের সমাজে বিয়ে করতে পারলেও চাকমা মেয়েদের বিয়ে চাকমা সমাজেই হয়।

চাকমা রীতিতে কন্যাপক্ষের কিছু দেওয়ার রীতি না থাকলেও বাঙালি প্রভাবে তাদের মধ্যেও এখন যৌতুক প্রথার প্রচলন ঘটছে। নিয়মানুসারে চাকমা বিয়েতে বরপক্ষই কন্যাকে পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, উপঢৌকন দিয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে আসে।

চাকমা

২. পরিবার: চাকমাদের মধ্যেও বাঙালিদের মতো পিতৃতান্ত্রিক পরিবার লক্ষ করা যায়। চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তান-সন্ততিরা পিতার পরিচয়েই পরিচিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার হওয়ায় চাকমা পরিবারের ক্ষমতা স্বামীর হাতে কিংবা বয়স্ক পুরুষের হাতেই থাকে। তারা সাধারণত একক পরিবারেই বসবাস করে। পুত্রসন্তানরা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সাথে সাথেই তাদের বিবাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তারা বিয়ের পর বংশানুক্রমে পিতার গ্রামেই বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকে।

চাকমা

৩. পাড়া, এলাকা বা আদাম: চাকমা সমাজে পাড়া বা এলাকা 'আদাম' নামে পরিচিত। এটি তাদের পারিবারিক সংগঠনের তুলনায় বৃহৎ। কতকগুলো চাকমা পরিবারের সমন্বয়েই এ 'আদাম' গঠিত হয়। আদামের প্রধানকে চাকমা রাজা নিয়োগ দিয়ে থাকেন। তিনি 'কারবারি' নামে পরিচিত হন। চাকমা রাজা গ্রাম বা মৌজার প্রধানের সাথে কথাবার্তা বলেই তাকে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। কারবারির কোনো বেতন-ভাতা নেই। আদামের সদস্যদের সম্মানই তার কাছে প্রধান। আদামের প্রধান হিসেবে তিনি যেসব দায়িত্ব পালন করে থাকেন তা হলো- আদাম বা পাড়ার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সালিস বা বিচারের কাজে গ্রাম বা মৌজাপ্রধানকে সাহায্য করা, মৌজাপ্রধানকে খাজনা আদায়ে সাহায্য করা ইত্যাদি। কারবারির তত্ত্বাবধানেই আদামের চাকমা সদস্যরা একসাথে ধর্মীয় ও বৈবাহিক অনুষ্ঠান এবং কৃষিকাজে অংশ নেন। তাই চাকমাদের পাড়া বা আদামের জন্য কারবারি একজন অপরিহার্য ব্যক্তি।

৪. আবাসস্থল: চাকমারা সাধারণত পাহাড়ের ঢালে বাঁশ ও কাঠের তৈরি এক ধরনের মাচাং ঘরে বাস করে। তবে শিক্ষা ও আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে তারা এখন আধুনিক বাড়িঘরে বসবাস করতে শুরু করেছে।

চাকমা

৫. গ্রাম বা মৌজা: চাকমা আদাম বা পাড়ার চেয়ে বৃহৎ সংগঠন হলো গ্রাম বা মৌজা। চাকমা জনগোষ্ঠী গ্রামকে 'মৌজা' বলে সম্বোধন করে থাকেন। কতকগুলো চাকমা আদামের সমন্বয়ে গঠিত হয় চাকমাদের গ্রাম বা মৌজা, চাকমাদের মৌজার প্রধানকে হেডম্যান বলা হয়। তিনি চাকমা রাজার সুপারিশে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। হেডম্যানের বেলাতেও কারবারির মতো বংশপরম্পরায় হেডম্যান হওয়ার রীতি নেই। তবে প্রায়ই হেডম্যানের যোগ্যপুত্রই হেডম্যান হয়ে থাকেন। হেডম্যান আগে বেতনভাতার বদলে কিছু জমির খাজনা মওকুফ পেতেন এবং আদায়কৃত খাজনার নির্দিষ্ট অংশ কমিশন হিসেবে পেতেন। তবে বর্তমানে তিনি এসব সুবিধার পাশাপাশি মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতাও পাচ্ছেন। আবার পাহাড়ি জুম জমি থেকে খাজনা আদায় করে তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিজে রেখে বাকিটা চাকমা রাজাকে বুঝিয়ে দেন। চাকমা রাজা আবার তার একটা অংশ নিজে রেখে বাকিটা সরকারকে বুঝিয়ে দেন।

চাকমা

৬. চাকমা সার্কেল: চাকমাদের গ্রাম বা মৌজার চেয়ে বৃহৎ সংগঠন হলো চাকমা সার্কেল। চাকমা সমাজের কয়েক শ গ্রাম বা মৌজার সমন্বয়ে চাকমা সার্কেল গড়ে ওঠে। চাকমা সার্কেলের প্রধান হলেন চাকমা রাজা। তিনি বংশানুক্রমে নিযুক্ত হন। চাকমা সার্কেলের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, চাকমা রীতি অনুসরণপূর্বক সামাজিক বিচার-সালিস পরিচালনা করা, হেডম্যানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খাজনার নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে প্রদান করা ইত্যাদি কার্যাবলি পরিচালনা করা চাকমা সার্কেলের প্রধান তথা চাকমা রাজার দায়িত্বভুক্ত। আবার তিনি একজন হেডম্যানও হন। একাধিক গ্রাম বা মৌজার হেডম্যান হিসেবে তিনি মৌজার খাজনা আদায় ও সামাজিক বিচারকার্য পরিচালনা করেন। তিনি চাকমা সমাজ ও চাকমা সার্কেল সম্পর্কে ডেপুটি কমিশনারের একজন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতা হিসেবেও ভূমিকা পালন করেন। চাকমা সার্কেলের প্রধান তথা চাকমা রাজা চাকমা সমাজের আদর্শ। তিনি চাকমা সমাজের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করেন। তাই চাকমা সম্প্রদায়ের কাছে তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।

চাকমা

৭. জীবিকা নির্বাহ: অনাদিকাল ধরেই চাকমা জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে চাষ বা জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। তাই চাকমা সমাজের অর্থনীতি এর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জুম চাষের পূর্বে তারা পাহাড়ের গাছপালা কেটে শুকিয়ে ও পুড়িয়ে চাষযোগ্য করে তোলে। এরপর সেখানে তারা ধান, তিল ও অন্যান্য ফসলের মিশ্রিত বীজ একসাথে রোপণ করে। পরে তা পাকলে তারা তা ঘরে তোলে। এটিই হলো জুম চাষ পদ্ধতি।

চাকমা সমাজে জমি বর্তমানে পুরাপুরি ব্যক্তিমালিকানায় না থাকায় তারা যার যার পছন্দ অনুযায়ী যেখানে সেখানে জুম চাষ করছে। জুম চাষকে ঘিরে জমির যে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তা নিরসনে সরকার কাজ করছে। সরকার থেকে জুম চাষকে প্রতিনিয়ত নিরুৎসাহিত করলেও এর উপস্থিতি এখনও চাকমা সমাজে রয়েছে।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

চাকমা

চাকমা উত্তরাধিকার প্রথা অনুযায়ী পুত্ররাই জমির অধিকার পেয়ে থাকে, কন্যারা পায় না। জুম চাষের পাশাপাশি তারা বাঙালিদের কাছ থেকে শেখা হালচাষ পদ্ধতি কাজে লাগিয়েও চাষাবাদ করে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে সমতল ভূমিতে তারা ধান চাষ করে। এর পাশাপাশি তারা রবার, কাঠের গাছ এবং ফলের চাষও করে থাকে। চাষাবাদের পাশাপাশি চাকমাদের মধ্যে

অনেকে মোরগ-মুরগি ও শূকর পালন করেও জীবিকা নির্বাহ করে। বাঁশ-বেত দিয়ে কুটির শিল্পজাত দ্রব্য তৈরিতেও তারা পারদর্শী এবং তাদের কাপড় বোনার জন্য নিজস্ব তাঁতও রয়েছে। এর মাধ্যমে অনেকে কাপড় বাজারজাতকরণের ব্যবসায়ও পরিচালনা করে।

চাকমা

৮. শিক্ষা: চাকমারা অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার তুলনায় অধিক শিক্ষিত। এমনকি গ্রুপের মধ্যে বৃহৎ চাকমা জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাকমাদের বসবাসরত গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলগামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বর্তমানে তারা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাচ্ছে। এর পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজি ভাষার আধুনিক শিক্ষাতেও তারা শিক্ষিত হচ্ছে। উচ্চ শ্রেণিতে লেখাপড়া এবং পরবর্তীতে চাকরি ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ কোটার ব্যবস্থা থাকায় তাদের মধ্যে শিক্ষার গতিশীলতা বাড়ছে এবং তাদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। এসব সুবিধার কারণেই বর্তমানে বৃহত্তর বাঙালি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে চাকমা মহিলা ও পুরুষদের সমঅংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। এসব কারণেই সামাজিক স্তরবিন্যাসে তারা শিক্ষা ও আয়কেই প্রধান উপাদান বলে গণ্য করে।

চাকমা

চাকমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা

চাকমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা অত্যন্ত বর্ণিল। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহও ঐতিহ্যবাহী। এগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১. পোশাক-পরিচ্ছদ: চাকমাদের মধ্যে মহিলারাই ঐতিহ্যবাহী পোশাকের ধারা বজায় রেখেছে। চাকমা পুরুষরা পাশ্চাত্যের ফ্যাশনের জন্য ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করা বাদ দিয়েছে।

চাকমা মহিলারা যে পোশাক পরিধান করে তা দুই ধরনের কাপড়ের অংশ মিলে তৈরি। একটি হলো স্কার্টের মতো নিচের অংশে পরিধানযোগ্য। এটি কোমর থেকে গোঁড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত। আর দ্বিতীয় অংশ বুকের ওপরে পরিধান করা হয়। অনেকটা ব্লাউজের মতো। এটি উপরের অংশে অত্যন্ত আঁটসাঁটভাবে বাঁধা থাকে।

স্কার্টের মতো নিচের অংশে পরিধানযোগ্য কাপড়ের রং সাধারণত ঐতিহ্যগতভাবে কালো অথবা নীল হয়। এর সাথে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত লাল পাড়ের সংযোগ থাকে। চাকমা নারীরা কাপড় বুননে দক্ষ বলে তারা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে নকশা দিয়ে কাপড় বানিয়ে পরিধান করে।

চাকমা

২. খাদ্যাভ্যাস: চাকমা সম্প্রদায়ের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। ভাতের সাথে তারা শাকসবজি, মাছের শুঁটকি, বিভিন্ন পাখি ও প্রাণীর মাংস খেয়ে থাকে। নিজেদের তৈরি মদ এরা উৎসবের সময় পান করে। চাকমাদের একটি ঐতিহ্যবাহী খাদ্য হলো বাঁশের কোঁড়ল রান্না। তারা মাছ, সবজি ও ঝালজাতীয় মসলা বাঁশের মধ্য দিয়ে অল্প আঁচে সিদ্ধ করে। পরে খাবার কলাপাতায় মুড়িয়ে আগুনের পাশে রেখে দেয়। এ খাবার তাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়।

৩ . সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: চাকমারা বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব উদ্যাপন করে থাকে। তাদের সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ উৎসব হলো বুদ্ধ পূর্ণিমা। এটি মহামানব বুদ্ধের জীবনে ঘটে যাওয়া তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্যাপিত হয়। এটি পূর্ণিমার রাতে বৈশাখ মাসে পালিত হয়। সাধারণত ইংরেজি বছরের মে মাসের দিকে এ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এ উৎসবের দিন এবং অন্যান্য উৎসবের দিনও তারা সুন্দর পোশাক পরিধান করে মন্দিরে যায়। তারা সেখানে গিয়ে বুদ্ধের মূর্তির সামনে ফুল অর্পণ করে, মোম জ্বালায় এবং পণ্ডিত বা পুরোহিতের কাছ থেকে স্তুতি শ্রবণ করে। এছাড়া তাদের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ উৎসব হলো 'বিজু'। এটি বাংলা নববর্ষের দিন পালিত হয়। অত্যন্ত আনন্দের সাথে চাকমারা তিন দিনব্যাপী এ উৎসব পালন করে। এ অনুষ্ঠানের তিনটি পর্ব হলো 'ফুলবিজু' 'মূলবিজ' এবং 'নুত্তবজুর' (নতুন বছর) বা গোজ্যাপোজ্যা দিন। এ উপলক্ষে তারা তাদের বাড়িঘর ফুল দিয়ে সাজায়, ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের কাছ থেকে আশীর্বাদ কামনা করে।

চাকমা

৪. চাকমাদের ভাষা: চাকমাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে, যা চাকমা বা চাঙমা ভাষা নামে পরিচিত। চাকমাদের ব্যবহৃত ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে বর্তমানে তারা একটি বাংলা উপভাষায় কথা বলে এবং বাংলা হরফে ওই বাংলা উপভাষা তারা লিখে থাকে। চাকমাদের মনখেমের লিপি থাকলেও তা লেখার কাজে তারা তেমন একটা ব্যবহার করে না। তারা লেখার কাজে বাংলা হরফই ব্যবহার করে থাকে।

বাংলা, পালি ও অসমিয়া ভাষার সঙ্গে চাকমা ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চাকমা ভাষাকে বাংলার উপভাষা বলে অভিহিত করেছেন। জর্জ গ্রিয়ারসনও চাকমা ভাষাকে 'Broken Dialect of Bengali' বলে উল্লেখ করেছেন। বিরাজমোহন দেওয়ানের 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে জানা যায়, চাকমারা ১৯৬১ সালে যে ভাষায় কথা বলতেন তার ৮০ ভাগই বাংলা শব্দ। মি. সুগত চাকমার 'চাঙমা বাংলা কথাবার্তা' অভিধানে চাকমা ও বাংলা শব্দ পাশাপাশি লিখেছেন এবং এতে দেখা যায় দুই ভাষার শব্দে যথেষ্ট মিল রয়েছে। শব্দভাণ্ডারের দিক থেকে চাকমা ভাষায় অনেক আরবি-ফারসি, মারমা, আসামি, চীনা প্রভৃতি ভাষার শব্দ রয়েছে।

চাকমা

৫. চাকমাদের ধর্ম: চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাকমারা বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান আনন্দের সাথে উদ্যাপন করে থাকে। চাকমাদের বসবাসরত এলাকায় প্রায়ই বৌদ্ধ মন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরগুলোকে 'ক্যাং' বলা হয়। চাকমাদের মন্দিরে বৌদ্ধভিক্ষু বা শ্রামন থাকেন যাদের মাধ্যমে তারা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। চাকমারা পণ্ডিত পুরোহিতের কাছে স্তুতি শ্রবণ করে থাকে। চাকমাদের বিভিন্ন বড় বড় বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে আনন্দ বিহার, রাঙামাটির মৈত্রী বিহার, বনভান্তের বিহার, রাজ বনবিহার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধ মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বেলে, ফুল ও খাদ্য দিয়ে তারা পূজা করে থাকে। চাকমাদের মধ্যে গঙ্গা পূজা, লক্ষ্মীপূজা করারও প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন শুভ-অশুভ দেবতার প্রতি বিশ্বাসও লক্ষ করা যায়। তবে এসব বিষয়ের উপস্থিতি থাকলেও চাকমারা বেশ জাঁকজমকভাবে বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পালন করে আসছে।

চাকমা

৬. মৃত্যু-পরবর্তী অনুসৃত রীতি বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: চাকমা সমাজে মৃত্যুর পর মৃতদেহ পুড়িয়ে সৎকার করা হয়। তবে সাত বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে কবর দেওয়া হয়। তাদের সমাজে বুধবারে মৃতদেহ পোড়ানোর বেলায় নিষেধ রয়েছে। মৃতদেহকে স্নান করিয়ে, সাজিয়ে তারা বাঁশের তক্তার উপর শুইয়ে দেয়। আত্মীয়স্বজন এবং গ্রামবাসী মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করতে আসে। এসময় বিরতি দিয়ে দিয়ে ড্রাম বাজানো হয়। মৃতদেহের সৎকার সাধারণত বিকেলের দিকে সম্পন্ন হয়। এ আচার-প্রথা একজন পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাকমারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। তাই সৎকার পরবর্তী সকালে তারা উক্ত স্থানে গিয়ে মৃত ব্যক্তির পায়ের ছাপ খোঁজে মাটিতে। তারা বিশ্বাস করে, উক্ত ব্যক্তি পরবর্তী জন্মে যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে তার কিছু চিহ্ন সৎকার সম্পন্নকৃত স্থানে রেখে যায়। অনেকে মৃত ব্যক্তির হাড় সংগ্রহ করে তা মাটির পাত্রে রেখে দেয় এবং পরবর্তীতে কাছে অবস্থিত নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য শোককাল সাত দিনব্যাপী স্থায়ী হয়। এসময় তারা মাছ-মাংস খেতে পারে না। সাত দিনের বেলায় চূড়ান্ত রীতি অনুষ্ঠিত হয়। এটি 'সাতদিন্যা' নামে পরিচিত। এসময় তারা মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্য, অর্থ, কাপড় ইত্যাদি উৎসর্গ করে।

THANK YOU

গারো

গারোদের উৎপত্তি

গারোরা নিজেদের আচিক বা 'পাহাড়ের মানুষ' বা মান্দি কিংবা আচিক-মান্দি বলে পরিচয় দেয়। গারো অভিধাটি তাদের নিজেদের দেওয়া নয়। অনেকে মনে করেন, 'মান্দি' শব্দটি মান্নিদি বা মান-এর পুত্র থেকে এসেছে। তাদের নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। গারো পাহাড়ের দক্ষিণাংশে গারা বা গানচিং নামের এক জাতিসত্তার নাম পাওয়া যায়। তাই অনেকে মনে করেন, এখান থেকেই গারো নামের উৎপত্তি- গানচিং > গারা > গারো।

ঐতিহাসিক টলেমি সর্বপ্রথম তার লেখায় 'গারো' নামের উল্লেখ করেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন, গারোরা খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে তাদের আদি নিবাস ত্যাগ করে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যের দিকে এসেছিল। এ বিষয়ে B. C. Allen তার 'Assam District Gazetter' গ্রন্থে লিখেছেন, অতীতে গারো এবং বোড়ো ভাষী অন্যান্য উপজাতীয় লোকেরা চীনের ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের উত্তরাংশ থেকেই ভারতের উত্তর-পূর্বাংশের আসাম রাজ্যে এসেছিল। নৃবিজ্ঞানীদের ভাষ্য অনুযায়ী গারোদের মূল আবাস ছিল বর্তমান চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সিন কিয়াং প্রদেশে। পরবর্তীতে নানা কারণে তারা ওই অঞ্চল ত্যাগ করে প্রথমে তিব্বতে দীর্ঘদিন বসবাস করে এবং অনেকে সেখানে থেকেও যায়।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

গারো

তবে গারোরা ভারতীয় উপমহাদেশে কীভাবে প্রবেশ করে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, 'প্রাক-আর্য যুগে' গারোরা এ উপমহাদেশে প্রবেশ করে। গারো লোককাহিনি অনুযায়ী জানা যায়, তারা তিব্বত থেকে হিমালয় পর্বতমালার বিভিন্ন সংকীর্ণ গিরিপথ অনুসরণ করে ভুটান হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে এবং বর্তমান কুচবিহার অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করে। অতএব বলা যায়, বাংলাদেশে গারো নামে পরিচিত এ সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিজেদের 'মান্দি' নামে পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

গারো

গারোদের বসবাস

গারোরা প্রধানত বাস করে বাংলাদেশের উত্তর দিকে অবস্থিত গারো পাহাড় সংলগ্ন এলাকায়, টাঙ্গাইল মধুপুরের গড়, রংপুর জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, ময়মনসিংহ (মুক্তাগাছা), জামালপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর, গাজীপুর এবং সিলেটের সুনামগঞ্জের বেশ কিছু চা বাগানে। এর পাশাপাশি ভারতের আসাম (মেঘালয়) জেলাতেও গারোরা বসবাস করে। বাংলাদেশে বসবাসরত গারোরা প্রধানত সমতলী গারো হিসেবেই পরিচিত।

গারোরা ভারতের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চলে সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করে। ভারতের নাগাল্যান্ডে বসবাসরত বর্তমান গারো প্রজন্ম তাদের মাতৃভাষাতেও কথা বলে না এখন।

গারো

গারোদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

গারোরা নৃগোষ্ঠীগতভাবে মঙ্গোলয়েড। তাদের গোলাকৃতি মুখমণ্ডল, প্রশস্ত এবং চ্যাপ্টা নাক, ক্ষুদ্রাকৃতির কপাল, বৃহদাকারের কান, মোটা ঠোঁট এবং কোঁকড়ানো কালো চুল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এটিই নির্দেশ করে। তবে তাদের মধ্যে কারও কারও চুল সোজা। গারো পুরুষ ও মহিলাদের গড় উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট। গারো পুরুষদের মুখে দাড়ির পরিমাণ কম। গারো মহিলা-পুরুষের শারীরিক গঠন হালকা-পাতলা হলেও তারা বেশ শক্তিশালী ও পরিশ্রমী।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী গারোদের সংখ্যা ৮৪ হাজার ৫৬৫ বলে জানা যায়। আর বিশ্বব্যাপী তাদের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭,৫২,০০০-এর মতো। একটি সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে গারোদের জনসংখ্যা ২,০০,০০০। এছাড়া বর্তমানে ত্রিপুরাতে গারো জনসংখ্যা প্রায় ১৫,০০০। কেবল বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলাতেই প্রায় ২,০০,০০০-এর মতো গারো অধিবাসী রয়েছে বলেও জানা যায়। এটাও জানা যায়, ভারতের আসাম জেলার গারো পাহাড়ি এলাকায় প্রায় ২,৩৭,৮৪২ জন গারো অধিবাসী বসবাস করে। সুতরাং দেখা যায়, গারোদের সুনির্দিষ্ট জনসংখ্যার পরিমাণ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তাই তাদের জনসংখ্যার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ জানা যায় না।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

গারো

গারোদের সমাজব্যবস্থা

গারোদের সমাজব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১. সামাজিক সংগঠন গারো সম্প্রদায় দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত- আচ্ছিক ও লামদানি। মূলত বাসস্থানের ভিত্তিতে এ শ্রেণিবিভক্তি করা হয়। যারা সাধারণত পাহাড়ের পাদদেশে ও সমতল ভূমিতে বাস করে তাদেরকে লামদানি গারো এবং যারা পাহাড়ের গভীর অরণ্যে বাস করে তাদেরকে আচ্ছিক গারো বলা হয়। এ দুটি শ্রেণি আবার বেশকিছু গোত্রে বিভক্ত। এগুলো হলো- সাংমা, মারাক, মমিন, সিরা ও আবেং। তাদের এ ধরনের বিভিন্ন দল, গোত্র ও উপগোত্রকে তাদের ভাষায় 'চাচ্চি' এবং বংশকে 'মাহারি' বলা হয়। এসব গোত্র গারোদের সবচেয়ে বৃহৎ মাতৃসূত্রীয় দল। এ 'চাচ্চি' শব্দের অর্থ হলো 'আত্মীয় বা জ্ঞাতি'। চাচ্চি হলো গারোদের সর্ববৃহৎ গোত্রের নাম। প্রতিটি গোত্রই বহির্বিবাহ রীতি মেনে চলে।

গারো

এরা আবার ছোট ছোট কয়েকটি ক্ষুদ্র গোত্রে বিভক্ত। যার নাম 'মাচং'। এ গোত্রগুলোতেও বহির্বিবাহ রীতি এবং মাতৃসূত্রীয় রীতি অনুসৃত হয়। Playfair রচিত 'The Goros' গ্রন্থে ১২৭টি মাচং গোত্রের নাম পাওয়া যায়। আবার প্রতিটি মাচং-এর অধীনে কয়েকটি করে ক্ষুদ্র গোত্র রয়েছে, যাকে বলা হয় 'মাহারি'। এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা সবাই একসাথে বসবাস করে। তবে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় একই মাহারির লোক অন্য স্থানে গিয়েও বসবাসে বাধ্য হচ্ছে। এ 'মাহারি' দ্বারা মূলত একই বংশের লোককে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এ গোত্রগুলো ক্ষুদ্র হয় বলে এদের সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নির্ণয় করা সহজ। তবে 'মাচং' এর সদস্যদের রক্ত সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না।

গারো

২. বিবাহ ব্যবস্থা: গারো বা মান্দি সমাজে সন্তানরা মায়ের বংশের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় দুই বোনের ছেলেমেয়েরা একই বংশের ও একই গোত্রের হয়। এ কারণেই তাদের সমাজে খালাতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। এছাড়া নিজ বংশ এবং নিজ গোত্রের মধ্যেও বিয়ে করা নিষেধ। গারোদের বাসস্থান হলো মাতৃনিবাস বাসস্থান। অর্থাৎ বিয়ের পর স্বামী তার স্ত্রীর বাড়িতে বসবাস করে এবং সেখানেই পরিবার গড়ে তোলে।

গারো সমাজে মনোগামী (Monogamy) বা যুগল বিবাহ (এক স্বামী এক স্ত্রী) রীতিই বেশি লক্ষ করা যায়। তবে বহু স্ত্রী বিবাহ (Polygymy) রীতিও দেখা যায়। কখনো কখনো স্বামী তার স্ত্রীর বংশের পাত্রীকেও বিয়ে করে। গারোদের মধ্যে খালাতো ভাইবোন বিয়ে নিষিদ্ধ হলেও তারা মামাতো ও ফুফাতো ভাইবোনকে বিয়ে করতে পারে। অর্থাৎ তাদের সমাজে Parallel Cousin বিবাহ নিষিদ্ধ হলেও Cross Cousin বিবাহ অনুমোদিত। গারো সমাজে বিয়েতে লেনদেন তেমন হয় না।

গারো

৩. পরিবারের ধরন ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা: গারোদের পরিবার মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃনিবাস পরিবার হওয়ায় গারো বিবাহিত ছেলেরা স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে ওঠে এবং স্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের সাথে চাষাবাদ করে। গারো পরিবারে সন্তানরা মায়ের পরিচয়ে সমাজে পরিচিত হয়। এসব পরিবারে বা সমাজে মহিলারাই হয় সর্বক্ষমতার অধিকারী। সন্তানরা মায়ের বংশধারার সদস্য বলেই বিবেচিত হয়। মেয়েরা বংশানুক্রমে মায়ের সম্পত্তিতে অধিকার পায়। আর তাদের স্বামীরা তাদের বাড়িতে থাকে এবং জমিতে ফসল ফলায়। আবার গারো ছেলেরা বিয়ের পর অন্য এলাকায় বা অন্য বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর সাথে বসবাস করে। কোনো কারণে স্ত্রীর মৃত্যু হলে সে তার মা বা বোনদের পরিবারে ফিরে আসে এবং বসবাস করতে থাকে।

গারোদের মধ্যে উত্তরাধিকার লাভ করে ছোট মেয়ে তাকে নোকনা বলে। সে সাধারণত বসতবাড়ির মালিক হয়। এমনকি বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মা ছোট মেয়ের সাথেই থাকে এবং মৃত্যুর পর বাবা-মায়ের সৎকারের দায়িত্বও ছোট মেয়ে পালন করে। গারো সমাজে মায়ের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং মালিকানাধীন যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার মেয়েরাই হয়। যে মেয়ে তার মায়ের কাছ থেকে সম্পত্তি লাভ করে তাকে বলা হয় 'নোকনা'। 'নোকনা' অর্থ হলো পরিবারের ভিত্তি। আর নোকনার বোনেরা যারা সম্পত্তি পায় না তাদেরকে বলা হয় 'এগেট' অর্থাৎ অ-উত্তরাধিকারী। নোকনার জন্য তার পিতামাতাই স্বামী বা পাত্র পছন্দ করেন। নোকনার স্বামীকে বলা হয় 'নোকরম'। যার অর্থ পরিবারের খুঁটি বা স্তম্ভ'। নোকনা ও নোকরম নোকনার বাবা-মার বাড়িতেই বসবাস করে।

গারো

৪.আত্মীয়তার ধরন: গারোদের আত্মীয়তার সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। গারোদের সাথে বাঙালিদের আত্মীয়তার সম্পর্কে বেশ পার্থক্যও চোখে পড়ে। যেমন- চাচা ও মামার সাথে সম্পর্ক গারোদের ক্ষেত্রে বাঙালিদের মতো নয়। তাদের মধ্যে চাচার সাথে সম্পর্ক হয় বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মামার সাথে সম্পর্ক স্নেহ ও শাসনের। গারো পুরুষদের জন্য তাদের বোনের সন্তানেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আত্মীয়। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের বোনের মেয়েরা নিজের মেয়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়।

৫.বিবাহ বিচ্ছেদ: গারো সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা খুব কম ঘটে। তবে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তবে সালিসের মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়। এক্ষেত্রে বিচ্ছেদে স্বামী বা স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং দোষী ব্যক্তির গোষ্ঠীর লোক অন্য পক্ষকে জরিমানা দেওয়ার শর্তে বিচ্ছেদ ঘটায়।

৬. বিচারব্যবস্থা ও নেতৃত্ব: গারো সমাজে গ্রামীণ বিচার-আচার প্রধানত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচালনা করা হয়। তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কখনই গড়ে ওঠেনি। গারো সমাজে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিকাশ ঘটেছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা- থানা, ইউনিয়ন ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এর ফলে গারো নেতৃত্বে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

গারো

৭. জীবিকা নির্বাহ: গারো সমাজের অধিকাংশ মানুষেরাই দরিদ্র। তাদের প্রধান পেশা হলো কৃষিকাজ এবং তাদের মধ্যে অনেকেই দিনমজুরের মতো প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে কৃষিকাজ করে। এ কারণেই গারো অধিবাসীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য পরিচিত। গারোরা আগে জুম বা পালাক্রম চাষ করতেন। এ চাষে তারা প্রধানত ধান, কমলা, চা এবং নানা জাতের সবজি উৎপাদন করে। কিন্তু পরবর্তীতে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা ১৯৫০ সালের পর থেকে আর জুম চাষ করছে না। এখন তারা হাল চাষ বা কৃষিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এ কৃষি পদ্ধতিতে তারা প্রধানত ধান, নানা ধরনের সবজি, আনারস ইত্যাদি উৎপাদন করছে।

কৃষিভিত্তিক গারো অর্থনীতির চেহারা সময়ের পরিবর্তনে এখন বেশ বদলে গিয়েছে। কৃষিকাজের পাশাপাশি তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য এখন অন্যান্য কাজও করে। বর্তমানে তারা 'দকমান্দা' নামে একটি বিশেষ কাপড় বোনে। এটি তারা নিজেদের এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বুনে থাকে। এর পাশাপাশি তারা মাটির পাত্র বানিয়েও বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে থাকে। তবে বর্তমানে গারোদের অর্থনৈতিক অবস্থায় বেশ মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। সময়ের চাহিদায় গারো সমাজে শিক্ষার হারও বেড়েছে। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই এখন এনজিও, সরকারি অফিস, চিকিৎসা ক্ষেত্র, বিদ্যালয়ে ইত্যাদি স্থানে কর্মরত আছে। ফলে তাদের ঐতিহ্যবাহী কৃষি পেশা থেকে এখন অনেক গারোরাই বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

গারো

গারোদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা

গারোদের সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাদ্যাভ্যাস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাসস্থানের ধরন ইত্যাদি নিচে আলোচনা করা হলো-

১. পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার মান্দি বা গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো 'দকমান্দা' ও 'দকশারি'। আর পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো 'গান্দো'। সাধারণত গারোরা ঐতিহ্যবাহী গানি, গান্দো, বিকমাচো, রিকমাচ ইত্যাদি পোশাক পরিধান করে। তবে বর্তমানে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আধুনিক পোশাক পরিধান করে। গারো মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, সালোয়ার-কামিজ এবং ছেলেরা শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, জুতা ইত্যাদি পরিধান করে থাকে।

গারো ছেলে এবং মেয়েরা উভয়েই বিভিন্ন অলঙ্কার দিয়ে নিজেদের সাজাতে ভালোবাসে। তাদের ব্যবহৃত এসব গয়নার মধ্যে রয়েছে কানে পরার দুল যা 'নান্দংবি বা সীসা' নামে পরিচিত কানের উপরে পরার দুল যা 'নাদিরং' নামে পরিচিত 'নাতাপসি' যা কানের উপরে পরে বিভিন্ন আকৃতির ধাতু দিয়ে তৈরি বালা যা 'জাকসান' নামে পরিচিত, গলার হার বা 'রিপক' ইত্যাদি। এসব অলঙ্কার পরিধান করে গারোরা তাদের ঐতিহ্যকেই প্রকারান্তরে লালন করে চলে। তবে বর্তমানে এসব ঐতিহ্যবাহী গয়নার পাশাপাশি গারোরা আধুনিক স্টাইলের গয়না দিয়েও নিজেদেরকে সাজায়।

গারো

২. খাদ্যাভ্যাস: খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে গারোরা বেশ উদারপন্থি। তাদের প্রধান খাদ্য ভাত। এছাড়া তারা জোয়ার, ভুট্টা, কাসাভা মূল থেকে প্রাপ্ত শর্করাজাত খাদ্য ইত্যাদি খায়। তারা ছাগল, শূকর, হাঁস ইত্যাদি লালন-পালন করে এবং পরে তাদের মাংস উপভোগ করে। এছাড়া তারা বন্যপ্রাণী যেমন- বন্য ষাঁড় বা মহিষ, বন্য শূকর ইত্যাদিও খেয়ে থাকে। এর পাশাপাশি তারা মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, বান মাছ, স্টকি ইত্যাদিও খায়। তারা তাদের তরকারি রান্নায় নানা ধরনের পটাশিয়াম লবণ ব্যবহার করে। তাদের একটি ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় খাদ্যের নাম হলো 'খাড়ি'। এটি মুরগির মাংস দিয়ে রান্না করা হয়। তারা শিকড় অথবা কাঁচা বাঁশ রান্নায় বিশেষ করে পটাশিয়াম লবণ ব্যবহার করে। তাদের মধ্যে মদ পান করার রীতিও প্রচলিত আছে।

৩. বাসস্থানের ধরন: অধিকাংশ গারোই খুব সাদাসিধে বাড়িতে বসবাস করে। এসব বাড়িঘর বাঁশ, খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। অনেকে আবার ইটের দেয়াল এবং টিনের ছাদ দিয়েও বাড়ি বানিয়ে বাস করে। অতীতে গারোদের সমাজে দোচালা লম্বা বাসগৃহ বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ ধরনের ঘরকে তাদের ভাষায় বলা হয় 'নক'। গারোদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই বেশ পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো।

গারো

৪.সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান: গারো সমাজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো ওয়ানগালা। সাধারণত অক্টোবরে বা নভেম্বরে এ উৎসব উদ্যাপিত হয়। শীত আসার আগে তাদের বর্ষ পঞ্জিকার সপ্তম বা দশম মাস মেজাফাং মাসে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসব সম্পর্কে বলা হয়, "যখন বনের মেগং নামক পাহাড়ি ফুল ফুটতে শুরু করে তখনই ওয়ানগালা আয়োজনের সময় হয় এবং পূর্ণিমা চাঁদের আলো থাকতে থাকতেই ওয়ানগালা শেষ করতে হয়।" ভালো ফলনের জন্য দেবদেবীর সুদৃষ্টি কামনার উদ্দেশ্যেই তারা এ উৎসব করে। গ্রামে সকলের ফসল ঘরে তোলা হলে নকমা সবাইকে ডেকে এনে ভোজের আপ্যায়ন করেন এবং এ উৎসবের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি নেন। এ অনুষ্ঠানটি মূলত তিন পর্বে বিভক্ত- রুগালা, সা. সাৎ, স. ওয়া এবং 'দামা গগাতা' বা 'জলওয়াতা' বা 'রুদ্রতা'। তাদের অধিকাংশ উৎসব কৃষিকে কেন্দ্র করেই উদ্যাপিত হয়। এর পাশাপাশি খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী গারোরা বড়দিন এবং খ্রিষ্টানদের পালিত অন্যান্য উৎসবও পালন করে থাকে।

গারো

৫. গারোদের ভাষা: গারোরা নিজেদের ভাষাকে বলে 'আচিক কুসিক' অর্থাৎ পাহাড়ি ভাষা। তবে এটি স্থানীয়ভাবে মান্দি বা গারো ভাষা হিসেবে পরিচিত। গারো ভাষার অন্যতম গবেষক Robbins Burling মনে করেন, এটি সিনো-টিবেটান (Sino-tibetan) শাখার টিবেটো-বার্মান (Tibeto-Barman) গোত্রের আসাম-বার্মার অন্তর্গত একটি আদিবাসী ভাষা। বোড়ো শাখার অন্তর্গত তিনটি ভাষার মধ্যে এটি উল্লেখযোগ্য। গারোদের নিজস্ব কোনো লিপি নেই। তারা মূলত রোমান লিপি ব্যবহার করে। বাংলাদেশে সীমিত পর্যায়ে বাংলা লিপির ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। বর্তমানে ভারতের আসাম অঞ্চলে গারোরা গারো ভাষায় লিখছেন। চীনা ভাষার সঙ্গে গারো ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও শব্দতাত্ত্বিক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বর্তমানে নানা ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকেও গারো ভাষায় অনেক শব্দ যুক্ত হচ্ছে। উনিশ শতকের শেষদিকে আমেরিকান মিশনারিরাই প্রথম গারো ভাষার জন্য লিপির প্রবর্তন করেন। বাংলা ও অসমিয়া ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে গারো ভাষাকে অনেকে এ দুই ভাষার মিশ্র রূপ বলে মনে করেন। তবে প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মৌলিক ভাষা।

গারো

৬. গারোদের ধর্ম: গারো বা মান্দিদের ঐতিহ্যবাহী আদি ধর্মের নাম 'সাংসারেক' এবং তাদের প্রধান দেবতার নাম 'তাতারা রাবুগা'। কিন্তু এ জাতিসত্তার অধিকাংশ মানুষ বর্তমানে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধর্ম 'সাংসারেক' এর অর্থ স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয়, তারা অন্যান্য ধর্মের সংস্পর্শে এসে নিজেদের ধর্মের এ নাম গ্রহণ করেছে অথবা অন্যরা তাদের ধর্মের এ নাম দিয়েছে। আরও ধারণা করা হয়, সম্ভবত বাংলা 'সংসার' শব্দ থেকে 'সাংসারেক' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই গারোরা আত্মার অবিনাশিতা এবং পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। তারা সর্বপ্রাণবাদ এবং অতিপ্রাকৃতকেও বিশ্বাস করে। তারা সে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস স্থাপন করে তার নাম তারা দিয়েছে মিতে বা মাইতে। মাইতে বলতে তারা 'দেবদেবী' এবং 'প্রেতাত্মা' উভয়কেই বুঝিয়ে থাকে। তারা বিশ্বাস করে, কিছু মাইতে দয়ালু, পরোপকারী তথা বন্ধুবৎসল। আবার কিছু মাইতে নির্দয় এবং শত্রুভাবাপন্ন। তারা আরও বিশ্বাস করে, মাইতে জঙ্গলে, পাহাড়ে এবং আকাশে বসবাস করে। তারা কখনো মাইতেদের দেখেনি। তবে তারা উভয় ধরনের মাইতেকেই পূজা-অর্চনার মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখতে চায়।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

গারো

খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী গারোরা রোমান লিপির সাহায্যে আচিক ভাষায় লেখা পূর্ণাঙ্গ বাইবেল পাঠ করে থাকে। 'বাইবেল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া' এ বাইবেল প্রকাশ করেছে। আবার 'বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি' কর্তৃক বাংলা লিপিতে আবেং উপভাষা ব্যবহার করে 'নিউ টেস্টামেন্ট বাইবেল' প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ গারো জনগোষ্ঠী এ বাইবেলই পাঠ করে থাকে। ব্যাপটিস্ট এবং ক্যাথলিক মিশনারি কর্মীরাই গারোদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ব্যাপটিস্টরা সংখ্যায় বেশি। আবার মধুপুর গড়ে গারোদের মধ্যে ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশি।

গারো

৭. মৃত্যু-পরবর্তী রীতি বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: গারোদের মধ্যে মৃতদেহকে পোড়ানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। তারা মৃত্যুর পর মৃতদেহকে গোসল করায় এবং গোসলের পর মৃতদেহকে মেঝেতে রাখে। মৃতদেহের মাথার কাছে তারা বিভিন্ন খাবার রেখে দেয়। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে- চাল, ভাত, ডিম ইত্যাদি। মৃতদেহকে দিনের আলোতে পোড়ানোর তাদের কোনো রীতি নেই। তারা মৃতদেহকে কমপক্ষে এক দিন এক রাত ওখানেই রেখে দেয় এবং পরে কোনো এক রাতে সাধারণত দ্বিতীয় রাতে পোড়ায়। পরবর্তীতে মৃতদেহ পোড়ানোর পর ছাই জঙ্গলে ফেলে দেয়। মৃত ব্যক্তির হাড়গুলো তারা মাটির পাত্রে তুলে মৃতের বাড়ির কাছে মাটির গর্তে পুঁতে রাখে। গারোরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস, আত্মা অমর এবং মৃত্যুর পর আত্মা চিকমাং নামক স্থানে চলে যায়। তারা মনে করে, চিকমাং হলো মৃতের দেশ।

এখানে কেবল মৃতরাই যেতে পারে, জীবিতরা নয়। তারা এসবকে ঘিরে অনেক ধরনের বিশ্বাস স্থাপন করে। গারো পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বে পাহাড়ের চূড়ায় চিকমাং অবস্থিত বলে তাদের বিশ্বাস। গারোরা এটাও বিশ্বাস করে যে, যদি কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করে কিংবা কোনো হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মারা যায় তবে সে পরজন্মে প্রাণী বা জন্তুরূপেই জন্ম নেয়।

THANK YOU

সাঁওতাল

সাঁওতালদের উৎপত্তি

নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা সাঁওতালরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম। ধারণা করা হয়, তারা এক সময় উত্তর ভারত থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বসবাস করত। অতুল সুরের মতে, ভারত থেকে তারা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিল আনুমানিক ত্রিশ হাজার বছর পূর্বে। তারা যে আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে বসবাস করত এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তারা মূলত হাজারিবাগ, মালভূম এবং বিহার সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস করত প্রাচীন আমল থেকেই। মুঘল আমলে তারা বিতাড়িত হয়ে হাজারিবাগ, মালভূমের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছেড়ে সাঁওতাল পরগনা ও নিকটস্থ জঙ্গলে আবাস গড়ে তোলে।

সাঁওতাল নামকরণ নিয়েও বেশ দ্বিমত রয়েছে। তারা নিজেদের বলে 'হোড়'। 'হোড়' অর্থ হলো মানুষ। Skrefsrud-এর মতে, 'সাঁওতাল' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'সুতার' (Soontar) থেকে। এটি বাঙালিদের প্রদত্ত খেতাব বলে মনে করা হয়।

সাঁওতাল

১৮৩৬ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যে তাদের জন্য একটি এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়, যা সাঁওতাল পরগনা, নামে পরিচিত। পরে সেখানে বহিরাগত মহাজন ও ব্যবসায়ীরা এসে তাদের ওপর নির্যাতন শুরু করে এবং এরপরই হয় ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মহাজনদের পক্ষ নিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করায় সাঁওতালদের প্রায় ১০ হাজার বিদ্রোহী নিহত হয়। এরপরই তারা বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ ও আসামে পাড়ি জমায় বলে অনেকে ধারণা করেন।

বাংলাদেশে সাঁওতালদের আগমন ঘটেছে নানা কারণে। এসব কারণের মধ্যে যেমন জমিদার মহাজনরা তাদের কাজের প্রয়োজনে সাঁওতালদেরকে উত্তরবঙ্গে এনেছেন, তেমনি তাদের নিজস্ব কারণও রয়েছে। তারা নিজেরাই জীবিকার সন্ধানে খাদ্য ও আবাসস্থান সংকটে এমনকি ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েও এ অঞ্চলে চলে এসেছে।

সাঁওতাল

সাঁওতালদের বসবাস

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল তথা বৃহত্তর রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর, রংপুর এবং জয়পুরহাট জেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বসবাস। ধারণা করা হয়, তাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার রাজ্য ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের এসব জেলায় পাড়ি জমায় এবং বসতি স্থাপন করে। সিলেটের চা বাগানেও কর্মসূত্রে অসংখ্য সাঁওতাল অধিবাসী দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে তাদের বসবাস রয়েছে। নেপালেও এদের একটি ক্ষুদ্রাংশের বাস রয়েছে।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

সাঁওতাল

সাঁওতালদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

নৃগোষ্ঠীগত বিচারে ধারণা করা হয়, সাঁওতালরা আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid)। অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের সাথে তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাদের গায়ের রং কালো এবং নাক নিগ্রোদের মতো চ্যাপ্টা। মাথার খুলি গোলাকার, মুখগহ্বর বড়, ঠোঁট মোটা, চুল কালো এবং কোঁকড়া। তাদের দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। তাদের এসব দৈহিক বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে আদি-অস্ট্রেলীয় দলের সদস্য বলে চিহ্নিত করে।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা ১,৪৭,২১২ জন। একটি সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, বিশ্বব্যাপী সাঁওতালদের মোট জনসংখ্যা হলো ৬০,৫০,০০০। এর মধ্যে ভারতের ঝাড়খণ্ডে ২৪,১০,৫০৯ জন, পশ্চিমবঙ্গে ২২,৮০,৫৪০ জন, বিহারে ৩,৬৭,৬১২ জন, উড়িষ্যায় ৬,২৯,৭৮২ জন আর নেপালে সাঁওতালদের একটি ক্ষুদ্রাংশের বসবাস রয়েছে, যাদের সংখ্যা প্রায় ৪২,৬৯৮ জন।

সাঁওতাল

সাঁওতালদের সমাজব্যবস্থা

সাঁওতালদের সমাজব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে বেশকিছু বিষয় আলোচনা করা হবে সেগুলো নিম্নরূপ-

১. গ্রাম পঞ্চায়েত সাঁওতাল সমাজের মূলভিত্তিই হলো গ্রাম পঞ্চায়েত। সাঁওতাল গ্রাম কয়েকটি বৃত্তে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি বৃত্তের তত্ত্বাবধান করেন একজন 'পঞ্চায়েত'। যার অধীনে থাকে কয়েক একর নিষ্কর ভূমি। প্রতিটি গ্রামেই 'পঞ্চায়েত' রয়েছে। পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য সাতজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থাকেন। তারা হলেন- মান্যহি, জগমান্যহি, পডেৎ, পারাণিক, জগ পারাণিক, নায়কে ও কুডাম নায়কে। জানগুরু পঞ্চায়েত সদস্য নয়, তাকে তান্ত্রিক ও ধর্মগুরু হিসেবে গণ্য করা হয়। 'মানযহি' বা 'মাঝি' হলেন গ্রামপ্রধান। তার একজন সহকারীও নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তার নেতৃত্বেই গ্রামের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পাদিত হয়।

সাঁওতাল

২. বিবাহ, পরিবার ও উত্তরাধিকার পদ্ধতি: সাঁওতালদের মধ্যে ১২টি গোত্র রয়েছে। যাদের নাম হলো- হাঁসদা, মার্ডি, মুরমু, বাসকে, হেমরম, বেসরা, সরেন, চড়ে, কিসকু, পাউরিয়া, টুডু ও সোয়ালে। তাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনি মতে এ গোত্রগুলো তাদের আদি পিতা পিলচু হাড়াম এবং আদি মাতা পিলচু বুড়হি। তারা এ গোত্রগুলো সৃষ্টি করে সাঁওতালদের মধ্যে ভাইবোনের বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে। তাদের মধ্যে বহির্বিবাহ প্রচলিত। অর্থাৎ নিজ গোত্রের বাইরে অন্য গোত্রের সদস্যকে তাদের বিয়ে করতে হয়। এসব গোত্রকে সাঁওতাল ভাষায় বলা হয় 'পারিস'। তাদের মধ্যে বিয়ে মূলত ছয় ধরনের হয়ে থাকে- কাপলা, গরদি জাওয়ে, ইতুত, নিরবোলক, সবঙ্গা ও কিরিভ জাওয়ে। তাদের মধ্যে যৌতুক প্রথা প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে সাধারণত পাত্রের পিতা পাত্রীকে প্রকাশ্যে যৌতুক দিয়ে থাকেন। সাঁওতালরা বহু বিবাহকে স্বাভাবিকভাবে দেখে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হলে বা মারা গেলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা যায়। তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও তালাকপ্রাপ্তদের বিয়েও প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া তাদের মধ্যে বড় ভাই মারা যাওয়ার পর ছোট ভাই বিধবা ভাবিকে বিয়ে করতে পারে। সাঁওতালরাই এমন একটি বৃহৎ দল যারা নিজের দলের ভিতরেই বিবাহ সম্পন্ন করে থাকে।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

সাঁওতাল

৩.সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা: সাঁওতালদের মধ্যে অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবী। তাদের সমাজে নারীদের উর্বরাশক্তির প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। তারা বিশ্বাস করে, নারীরাই প্রথম কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিল। সাঁওতাল নারী ও পুরুষরা উভয়েই খেতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাদের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায় বসবাসরত সাঁওতালরা মূলত কৃষি শ্রমিক। তাদের মধ্যে অধিকাংশ পরিবারই ভূমিহীন। তারা কৃষিক্ষেত্রে ধান, সরিষা, তামাক, মরিচ, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতি ফসল উৎপাদন করে। কৃষিকাজের পাশাপাশি সাঁওতালরা খেজুর পাতা ও ছন দিয়ে তৈরি নানা ধরনের মাদুর, ঝাড়ু ইত্যাদি বানিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটায় এবং হাটে বিক্রি করেও জীবিকা নির্বাহ করে।

সাঁওতাল

সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা

সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয় আলোচনা করা হবে সেগুলো নিচে উপস্থাপিত হলো-

১. খাদ্যাভ্যাস: সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত। এর পাশাপাশি তারা মাছ/মাংসও খেয়ে থাকে। তবে খুব কম পরিবারই মাছ/মাংস খেতে পারে। গরিব মানুষেরা আলু সিদ্ধ করে খায়, যাকে তারা 'সাং' বলে অভিহিত করে থাকে। তারা চাল থেকে 'হাড়িয়া' নামের একটি পানীয় তৈরি করে। অতিথি আপ্যায়নসহ বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে তারা এ পানীয় পরিবেশন করে থাকে। এটি তাদের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২. বাড়িঘরের ধরন: সাধারণত সাঁওতালরা মাটির দেয়ালের ওপর শন বা খড়ের ছাউনি দিয়ে চারচালা ঘর তৈরি করে বসবাস করে। নিম্নবিত্ত সাঁওতালরা এভাবে ঘর তৈরি করে বসবাস করে। কিন্তু যারা বিত্তবান তারা টিনের ছাউনি দেয়। সাঁওতালদের ঘরবাড়ি এবং গ্রামগুলোও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

৩. পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার: সাঁওতাল মেয়েরা কাঁধের উপর জড়িয়ে শাড়ি পরে এবং হাত-পা ও গলায় পিতলের বা নিরেট কাঁসার গয়না পরে। তারা কখনো মাথায় ঘোমটা দেয় না। অপরদিকে, সাঁওতাল পুরুষরা লুঙ্গি পরে। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ গলায় মালা এবং হাতে বালা পরে থাকে।

সাঁওতাল

৪.অনুষ্ঠান বা উৎসব: সাঁওতালদের নিজস্ব উৎসবের মধ্যে বাহা, সোহরায় ও এরোক উৎসব উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক কাল থেকে তাদের সমাজে যে উৎসবটি পালিত হয়ে আসছে তা হলো সোহরায়। এটি তাদের সবচেয়ে বড় এবং ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক উৎসব। ফসল গৃহে তোলার পর গৃহদেবতা, গোত্রদেবতা ও পূর্বপুরুষদের পূজা-অর্চনা আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে তারা আনন্দ-উৎসব করে এবং গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা ও বন্দনার মধ্য দিয়ে এ উৎসব পালন করে থাকে। সোহরায় উৎসবের দিনক্ষণ নির্ধারিত হওয়ার পর থেকেই তাদের মাঝে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। এ উৎসব উপলক্ষে তারা বাড়িঘর পরিষ্কার করে এবং লাল মাটি দিয়ে ঘরের দেয়াল ও পিলার রঙিন করে ছবি আঁকে ও উঠানে আল্পনা আঁকে। এ উৎসব ছয় দিনব্যাপী স্থায়ী হয়।

সাঁওতাল

৫. গান-নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র: সাঁওতালদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তাদের নৃত্য। তারা বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে দলীয়ভাবে নৃত্য পরিবেশন করে। তাদের মধ্যে নানা ধরনের নৃত্য প্রচলিত রয়েছে। তাদের দলীয় নৃত্য পরিবেশনই হলো তাদের আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম। তাদের একটি উল্লেখযোগ্য নাচ হলো 'লাগড়ে' নাচ। আবার তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ ধরনের নৃত্য পরিবেশিত হয়, যার নাম 'দং'। এর পাশাপাশি 'লাংরে', 'গুলুরি' ও 'হুমতি' নৃত্য সারা বছরই পরিবেশিত হয়। আবার 'দাসাই' নৃত্য কেবল ছেলেরাই উৎসব উপলক্ষে পরিবেশন করে থাকে। এসবের পাশাপাশি তাদের মাঝে 'রিনঝা' এবং 'ঝিকা' নাচও পরিবেশিত হয় কোনো কোনো অঞ্চলে। সেরেং, গাম-সেরেং ইত্যাদি গানও গায় তারা। তাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে যেগুলো বিখ্যাত তা হলো- তুমডাক, তামাক, তিরিও বা এক ধরনের বাঁশি ইত্যাদি।

৬. হাটবাজার: সাঁওতালদের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই হাট বা বাজারের আয়োজন হয়। কেনাবেচার পাশাপাশি এখানে এসে অবিবাহিত সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা নিজেদের জন্য পাত্রী-পাত্রও সন্ধান করে।

সাঁওতাল

৭. সাঁওতালদের ভাষা: সাঁওতালদের ভাষা অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের মুণ্ডা শাখার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও জীবন্ত ভাষা। তবে সাঁওতালদের কোনো নিজস্ব বর্ণমালা বা লিপি নেই। উনিশ শতকের দিকে মিশনারিদের সহায়তায় তাদের ভাষার চর্চা শুরু হয়। তারা মূলত রোমান লিপি ব্যবহার করে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যকে রূপদান করেছে। আবার বিশ শতকের তিন-চার দশকে শিক্ষিত সাঁওতাল সম্প্রদায় নিজের মাতৃভাষা চর্চা শুরু করে পঠন-পাঠন ও লেখালেখিতে। এরপর থেকে বাংলা ও নাগরি লিপিতে সাঁওতালি সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে থাকে। তবে বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যচর্চা সত্যিকার অর্থেই এখনও সেভাবে হয়নি। তবে ভারতে সাঁওতাল সমাজের একাংশের প্রচেষ্টায় অলচিকি লিপিতে সাঁওতালি সাহিত্যচর্চা শুরু করা হয়। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর উদ্যোগে সমগ্র ভারতে বসবাসকারী প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ সাঁওতাল অধিবাসী একসাথে দুটি বা তিনটি ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশের সাঁওতালরা দ্বিভাষী তো বটেই কখনো কখনো বহুভাষীও। তারা একত্রে সাঁওতালি, বাংলা ও সাদরি ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

সাঁওতাল

৮. সাঁওতালদের ধর্ম: সাঁওতালদের মধ্যে সনাতন ধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। আগে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব না থাকলেও বর্তমানে তাদের মধ্যে অনেকেই খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। তাদের ভাষায় দেবতাকে বলা হয় 'বোঙ্গা'। তাদের আদি দেবতা হলো সূর্য। তারা আরও যেসব দেবতার পূজা করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- 'মারাং বুরু' 'অড়াংক্ বোঙ্গা', 'আবগে বোঙ্গা', 'গোঁসাই এরা' প্রমুখ। তাদের বিশ্বাস সৃষ্টিকর্তা এবং আত্মা অমর ও অবিনশ্বর। তারা সর্বত্র বিরাজ করেন এবং তাদেরকে তুষ্ট করলেই মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিত হয়। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো উল্কি চিহ্ন আঁকা। সাঁওতাল পুরুষরা বাম হাতে কব্জির ওপর বেজোড় সংখ্যক উল্কি চিহ্ন আঁকে এবং মেয়েরা হাতে ও বুকে উল্কি চিহ্ন আঁকে। তাদের বিশ্বাস উল্কিবিহীন অবস্থায় কেউ মারা গেলে পরকালে তাকে যমরাজ কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

৯. মৃত্যু পরবর্তী রীতি বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: পারলৌকিক জগতে বিশ্বাসী সাঁওতালরা পরকালের স্বর্গ-নরকের প্রতিও বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেললে আত্মার শান্তি হয়। মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথাও সাঁওতাল সমাজে রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সাঁওতালদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। বর্তমানে তারাও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ধীরে ধীরে সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন করছে। তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হারও ধীরে ধীরে বাড়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাই সাঁওতালরা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

THANK YOU

মণিপুরি

মণিপুরিদের উৎপত্তি

উনবিংশ শতাব্দীর (১৮১৯-২৬) প্রথম দিকে বার্মার সৈন্যরা ভারতের মণিপুর রাজ্য আক্রমণ করলে সেখানকার কিছু জাতিসত্তার মানুষ এসে সিলেট অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ভারতের মণিপুর রাজ্য থেকে আসায় বাংলাদেশে তারা মণিপুরি' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের মণিপুরি সমাজ এককালে ভারতের মণিপুর রাজ্যের অধিবাসী ছিল বলে জানা যায়, ধারণা করা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক মণিপুরি রাজপুত্র কোনো কারণে বর্তমান সিলেট অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। তিনি এবং তার সফররত সঙ্গীরাই বর্তমান মণিপুরিদের পূর্বপুরুষ। মণিপুর রাজ্য ও মণিপুর শব্দের উৎপত্তি নিয়ে মণিপুর সমাজে অনেক পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত আছে। ধারণা করা হয় তাদের পূর্বপুরুষ 'পাখাংবা' ছিলেন একজন সর্প পুরুষ। তিনি জঙ্গলের ভিতরে অবস্থিত একটি বড় গর্ত থেকে সুপুরুষ যুবক হয়ে বেরিয়ে আসেন। এরপর পথ দিয়ে হাঁটার সময় জুমচাষরত এক সুন্দরী রমণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে সংসার জীবন শুরু করেন। এ দম্পতি হতেই মণিপুরি জাতির উৎপত্তি ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়। এভাবেই আরেকটি বৃহৎ জাতিসত্তা মণিপুরিদের উদ্ভব ঘটেছে। মণিপুরিরা একটি বৃহৎ জাতিসত্তা হলেও তাদের অভ্যন্তরে আরও তিনটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে যারা মণিপুরি হিসেবে পরিচিত। এ জাতিসত্তাগুলো হলো- ১. মৈতেয় মণিপুরি, ২. বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও ৩. পাঙ্গান মণিপুরি।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

মণিপুরি

মণিপুরিদের বসবাস

১৮১৯-২৫ এ সময়কালে বার্মা-মণিপুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর বার্মা প্রায় সাত বছর মণিপুরের ওপর শাসন চালায়। এ সময়কালে সেখানকার রাজা চৌরাজিৎ সিং তার দুই ভাই মারজিৎ সিং ও গাম্ভীর সিংকে নিয়ে সিলেটে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা, ময়মনসিংহের দুর্গাপুর এবং ঢাকার তেজগাঁওয়ে বসতি স্থাপন করে। তবে বর্তমানে এসব এলাকায় তাদের বসবাস নেই। বর্তমানে তারা বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট জেলায় বসবাস করে। তাদের বসবাসরত অঞ্চলগুলোর মধ্যে রয়েছে- সিলেটের তামাবিল, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, বড়লেখা, ভানুগাছ, হবিগঞ্জের আসামপাড়া, চুনারুঘাট, সুনামগঞ্জের ছাতক ইত্যাদি অঞ্চল।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

মণিপুরি

মণিপুরিদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

মণিপুরিদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে তাদেরকে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। তাদেরকে তিব্বত-বর্মি শাখার কুকি-চীন গোত্রভুক্ত জাতি বলে বিবেচনা করা হয়। তাদের গায়ের রং শ্যামলা, ফর্সা, হলদে ও বাদামি হয়। তাদের নাক কিছুটা চ্যাপ্টা, চোখ ছোট, দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। তাদের এসব শারীরিক গঠন-কাঠামো পর্যবেক্ষণ করে নৃবিজ্ঞানীরা চীনা ও বার্মিজদের সাথে তাদের সাদৃশ্য নিরূপণ করেছেন। ১৯৯১ সালের গণনায় বাংলাদেশে মণিপুরিদের সংখ্যা ছিল ২৪,৯০২ এবং ভারতে ছিল ১,২৭,২১৬ জন। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের আদিবাসী' (এথনোগ্রাফিয় গবেষণা) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট জেলায় মণিপুরিদের সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০।

মণিপুরি

মণিপুরিদের সমাজব্যবস্থা

মণিপুরিদের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১. সামাজিক সংগঠন: মণিপুরিদের মেইতেই জাতিসত্তা এখনও গ্রাম ও কৃষিনির্ভর। আবার মৌলভীবাজার জেলায় বসবাসরত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিষ্ণুপ্রিয়াদের মধ্যে কয়েকটি পরিবার মিলে একটি পাড়া গড়ে ওঠে। তাদের প্রতিটি পাড়া বা গ্রামে এক একটি দেবমন্দির ও মণ্ডপ রয়েছে। এসব মন্দির ও মণ্ডপকে ঘিরেই তাদের পাড়ার যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। আবার তাদের কয়েকটি গ্রামে পরগনা পঞ্চায়েতও রয়েছে। পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য তারা ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে নির্বাচন করে। এ কারণেই বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পরগনা পঞ্চায়েতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা: মণিপুরিদের মধ্যে বহির্বিবাহ প্রচলিত আছে। একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। যেমন- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিরা পাঁচটি গোত্রে বিভক্ত এবং তাদের একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ সমাজে নিষিদ্ধ। মণিপুরিদের মধ্যে তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা রমণীদের বিবাহও প্রচলিত। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ রীতিও প্রচলিত আছে। মণিপুরিদের মাঝেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ তাদের সমাজে মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে এসে বসবাস করে এবং পরিবার গড়ে তোলে। বর্তমানে তাদের মাঝেও একক বা অণু পরিবার গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

মণিপুরি

৩.জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ধরন: মণিপুরিদের মধ্যে একাধিক গোষ্ঠী রয়েছে। এসব গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে- অমংগোম, মৈরাং, লুয়াং, ক্ষুমল, নিংথৌজা, নংবা, খরা ইত্যাদি।

৪ . মণিপুরিদের অর্থনৈতিক অবস্থা: মণিপুরীদের প্রধান উপজীবিকা হলো কৃষি। পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত মণিপুরিরা সাধারণত স্থানান্তর কৃষি উৎপাদন করে এবং সমতলের অধিবাসীরা ভূমিতে কৃষি উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করে। পাহাড়ি মণিপুরিদের থেকে সমতলের মণিপুরিদের আর্থিক অবস্থা ভালো। মণিপুরি পুরুষ-মহিলা উভয়ে একই সাথে কৃষিকাজে অংশ নেয়। তারা নিজেদের জমিতে নিজেরাই খাদ্য উৎপাদন করে। তবে তাদের জমির পরিমাণ অত্যন্ত অপ্রতুল। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম তাদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং গোষ্ঠীর অন্য মানুষেরা ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে থাকে। মণিপুরিরা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী। তাই তাদের জীবনধারা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

মণিপুরি

মণিপুরিদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা

মণিপুরিদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা পর্যবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিচে উপস্থাপিত হলো-

১. খাদ্যাভ্যাস: মণিপুরিরা খাবারের ব্যাপারে খুব সচেতন। তারা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খায়। তারা মাছ-মাংস খায় না। তাই তাদেরকে নিরামিষভোজী বলা হয়। তাদের প্রধান খাদ্য ভাত। এছাড়া তারা বিভিন্ন ধরনের ডাল, শাকসবজিও খাবারের তালিকায় রাখে। সাধারণত মণিপুরি মহিলারা তরকারি রান্নায় কম তেল ব্যবহার করে থাকে। দুধ এবং মাখনও তাদের অত্যন্ত প্রিয় খাবার।

২. পোশাক-পরিচ্ছদ: মণিপুরিদের পোশাক-পরিচ্ছদেও অত্যন্ত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। মণিপুরি মেয়েদের বুক আবৃত করে লুঙ্গি পরিধান করা তাদের ঐতিহ্যের অংশ। অপরদিকে, মণিপুরি ছেলেদের মধ্যে সাধারণত ধুতি পরিধানের প্রচলন রয়েছে। তবে বর্তমানে অনেক মণিপুরি মেয়েদের শাড়ি পরতে দেখা যায়। নাচের সময় তারা বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করে। মণিপুরি মেয়েদের পোশাক নাগ-পোশাক হিসেবে অভিহিত।

মণিপুরি

৩. নাচ-গানের সংস্কৃতি ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী উপাদান: মণিপুরিরা তাদের নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে অত্যন্ত গর্ববোধ করে। বিশেষ করে তাদের নৃত্য অধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। মৈতেয় মণিপুরিদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, দৃশ্যশিল্প, তাঁতবস্ত্র ইত্যাদি ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এর পাশাপাশি তাদের তৈরিকৃত হস্তশিল্পের মধ্যেও তাদের সংস্কৃতির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

তবে মণিপুরিদের সংস্কৃতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো তাদের নৃত্য ও সংগীত। মণিপুরিদের নৃত্য ও সংগীত সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তারা বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। নাচের সাথে সাথে তারা লোকগীতিও পরিবেশন করে। তাদের নৃত্যের মধ্যে 'লাইহারাউবা' সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও প্রসিদ্ধ। এছাড়া তাদের মধ্যে 'থাবাল চংবা' নামের একটি নৃত্য প্রচলিত আছে যা মণিপুরি ছেলেমেয়ে উভয়েই নাচে। তাদের সমাজে 'পেনা ইসেই' নামের আরেক ধরনের নৃত্য প্রচলিত আছে।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

মণিপুরি

৪. সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠান: মণিপুরিদের মধ্যে তিনটি জাতিসত্তা থাকলেও তাদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মণিপুরিদের মধ্যে হিন্দুধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে থাকে।

মণিপুরি সমাজের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের মধ্যে কমলগঞ্জের রাসমেলা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ১৪৭ বছর ধরে এ মেলা চলছে। এছাড়া তারা আরও যেসব উৎসব পালন করে থাকে তার মধ্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে হোলি/দোলযাত্রা, ৯ দিনব্যাপী পালিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথীতে আয়োজিত রাসপূর্ণিমা, রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত গোষ্ঠলীলা বা রাখাল রাস ও রাসলীলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সংকীর্তন হলো বিশেষত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। কার্তিকের লক্ষ্মী পূর্ণিমা থেকে এক মাসব্যাপী রাসপূর্ণিমার দিন পর্যন্ত তাদের মণ্ডপে মণ্ডপে 'কার্তিকের পালি' বা 'মেরা' পার্বণও তারা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

মণিপুরি

৫. মণিপুরিদের ভাষা: ভাষাগত দিক থেকে মণিপুরিরা দুই ভাগে বিভক্ত- মৈতেয় মণিপুরি ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি। মৈতেয় মণিপুরিদের ভাষা হলো মৈতেয় নামের পুরনো একটি ভাষা। তাদের মাতৃভাষা 'মেইতেইলোন' বা টিবেটো বার্মান শাখার কুকি-চীন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। অপরদিকে, বিষ্ণুপ্রিয়াদের মণিপুরি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত। বাংলা ও অহমিয়া ভাষার সাথে তাদের ভাষা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এ ভাষাভাষীরা তাদের ভাষা প্রাচীন বলে দাবি করলেও এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই। পূর্বে মণিপুরি ভাষার নিজস্ব হরফ ছিল। অনেকের মতে, মৈতেয় লিপি ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত। ভারতের মণিপুর রাজ্যে এ লিপির প্রথম প্রচলন হয় মহারাজ পাংখংবার আমলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মণিপুরিদের অন্তর্গত পাঙ্গান জাতিসত্তাও মৈতেয় ভাষাই ব্যবহার করে থাকে।

মণিপুরি

৬. মণিপুরিদের ধর্ম: মণিপুরিদের মধ্যে তিনটি জাতিসত্তা রয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসও পৃথক। মেইতেই মণিপুরিদের প্রাচীন ধর্মের নাম হলো 'অপোকপা'। তাদের প্রধান দেবদেবীরা হলেন সানামাহি, পাখংবা, আপোকপা, শিদাবা। প্রাচীনকাল থেকেই তাদের মধ্যে নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যারা এ চিকিৎসা করতেন তাদের বলা হতো 'মাইবা' বা 'মাইবী'।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিরা বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। তারা হিন্দুধর্মের বৈষ্ণবীয় মতবাদে বিশ্বাসী। পূজা-পার্বণে তারা হিন্দুদের মতোই ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করে থাকেন এবং আনন্দের সাথে পূজা-অর্চনায় অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে, মণিপুরিদের পাঙ্গানরা হলো মুসলিম ধর্মাবলম্বী।

৭. মৃত্যু পরবর্তী রীতি বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: মনিপুরি সমাজে মৃতদেরকে দাহ করা হয়। দাহ করার সময় বড় বা ছোট ছেলেকে দিয়ে মুখাগ্নি করা হয়। তবে তিন বছরের কম বয়সী শিশুর মৃতদেহ মাটির হাঁড়িতে বা-টিনের পাত্রে ভরে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। মৃত্যুর চতুর্থ দিনে 'অস্থি সঞ্চার' দ্বাদশ দিনে 'ঘরসেংপা' ত্রয়োদশ দিনে 'সল্পা' এবং চতুর্দশ দিনে 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মৃতের স্বর্ণপ্রাপ্তির লক্ষ্যে তারা দান-দক্ষিণা দিয়ে থাকে।

THANK YOU

খাসিয়া

খাসিয়াদের উৎপত্তি

খাসিয়া বা খাসিদের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে। খাসিয়াদের নিজস্ব ঐতিহ্যময় পৌরাণিক আখ্যান ও গল্প থেকেই তাদের উদ্ভবের ইতিহাস অনুসন্ধান করা যায়। খাসিয়ারা প্রাচীন অধিবাসী যারা মিয়ানমার থেকে আসামে এসে বসবাস শুরু করে। তারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করে। আর বাংলাদেশে তাদের আগমন ঘটে আসাম থেকে প্রায় পাঁচ শ বছর আগে। তারা একেক স্থানে একেক নামে পরিচিত হয়। যেমন- দক্ষিণ-মণিপুর রাজ্যে বসবাসকারী আদিবাসীরা বর্মিদের কাছে পরিচিত। Ka-se বা Ka-the নামে। আবার গবেষকগণ তাদেরকে কখনো খাসিয়া, কখনো খাসি, কখনো খাছি ইত্যাদি নামে ডাকে।

'খাসিয়া' নামকরণ নিয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। ধারণা করা হয়, 'খাসি' শব্দটি ইন্দো-আর্য সাহিত্য শঙ্করদেবের 'ভাগবত পুরাণ' থেকে এসেছে। অনেকে মনে করেন, খাসিয়াদের আদিবাস আসামের খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ে হওয়ায় তাদের খাসিয়া বলা হয়। বিশিষ্ট গবেষক এ প্রসঙ্গে বলেন, "Khasian the name of the tribe living in the hilly region of Khasia."

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

খাসিয়া

খাসিয়াদের বসবাস

খাসিয়াদের আদি বাসস্থান আসামের জৈয়ন্তিয়া পাহাড়ে। ভারতের মেঘালয় রাজ্য ও তৎসংলগ্ন খাসিয়া জৈয়ন্তিয়া পাহাড় থেকে গারো পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এদের বসবাস। আসাম থেকে বাংলাদেশে খাসিয়াদের আগমন ঘটে প্রায় পাঁচশ বছর আগে।

বাংলাদেশে খাসিয়াদের বসবাস মূলত উত্তর-পূর্ব অংশ তথা সিলেট বিভাগে। সিলেটের তামাবিল, জাফলং, জৈয়ন্তাপুর এবং টাঙ্গাইল জেলায় রয়েছে তাদের বসবাস। সুনামগঞ্জের তাহিরপুর, ছাতক, গোয়াইনঘাট, কুলাউড়ার চা বাগান ইত্যাদি স্থানেও খাসিয়াদের বসবাস রয়েছে। আর বাংলাদেশের বাইরে ভারতের আসাম, মেঘালয়ের খাসি জৈয়ন্তিয়া পাহাড়, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি স্থানেও রয়েছে খাসিয়াদের বসবাস।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

খাসিয়া

খাসিয়াদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

নৃতাত্ত্বিক বিচারে খাসিয়ারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত বলে বিবেচিত। তাদের মুখমণ্ডল ফর্সা, নাক-মুখ চ্যাপ্টা, চোখ কালো ও ছোট, চোয়াল উঁচু, উচ্চতা মধ্যমাকৃতির, পায়ের গোড়ালি সরু। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাদের সাথে চীনা ও বার্মিজদের যথেষ্ট মিল আছে। তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিচার করে ঐতিহাসিক এবং নৃবিজ্ঞানীগণ স্ব-স্ব পক্ষেই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে খাসিয়া জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে মোট ১১,৬৯৭ জন। তবে 'বাংলাদেশ খাসিয়া সমিতি' অনুসারে বর্তমানে তাদের সংখ্যা ৩০,০০০ বলে জানা যায়।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

খাসিয়া

খাসিয়াদের সমাজব্যবস্থা

খাসিয়াদের সমাজব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হবে সেগুলো নিচে উপস্থাপিত হলো-

১. গ্রামীণ ব্যবস্থা: খাসিয়ারা গ্রামপ্রধানের শাসন মেনে চলে। তাদের প্রতিটি গ্রাম বা পুঞ্জিতেই নেতৃত্বদানকারী একজন ব্যক্তি থাকেন। খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর পুঞ্জিপ্রধান মন্ত্রী বা হেডম্যান হিসেবে অভিহিত হন। প্রতিটি গ্রামে তাদের গ্রাম পরিষদ রয়েছে যার সার্বিক দায়িত্ব তার ওপরই অর্পিত হয়।

২. বিবাহ ব্যবস্থা: খাসিয়া সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাদের সমাজে এমন কিছু গোত্র আছে যারা পরস্পর বিবাহ করতে পারে না। যেমন- টংপের, লিমবা, তেনজং এবং কংওয়াংরা পরস্পরের মধ্যে বিয়ে করতে পারে না। খাসিয়া সমাজে দুই ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। 'মনোমিলন বিবাহ' ও 'বন্দোবস্ত বিবাহ'। অভিভাবকদের মধ্যস্থতায় এবং পাত্র-পাত্রীর পছন্দেই তাদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে স্বগোত্র এবং একত্রে দুই বোনকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

খাসিয়া

৩. পরিবার ব্যবস্থা: গারোদের সাথে খাসিয়াদের পরিবার ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। খাসিয়াদের মধ্যেও মাতৃসূত্রীয় পরিবার দেখা যায়। এ রীতি অনুযায়ী বিয়ের পর স্বামীকে স্ত্রীর বাড়িতে এসে বসবাস করতে হয়। বিয়ের পর পুরুষ হয় গৃহরক্ষক এবং স্ত্রী হয় প্রধান। খাসিয়া সমাজে মহিলারাই হয় পরিবারের প্রধান এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তবে পারিবারিক কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পিতার মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মাতৃপ্রধান পরিবার আজ হলেও দুই-তিনটি সন্তান হওয়ার পর স্বামী যদি যথেষ্ট সচ্ছল হন তবে স্ত্রীকে নিয়ে আলাদাও থাকতে পারেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীকে স্ত্রীর বাড়িতে তার পরিবারের সদস্যদের সাথেই থাকতে হয়।

৪.বংশধারা ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা: মাতৃসূত্রীয় পরিবার হওয়ায় খাসিয়াদের মধ্যে সন্তানদের পরিচয়, সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার ইত্যাদি মায়ের গোত্র দ্বারাই নির্ণীত হয়। তাদের সমাজে মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হচ্ছে মেয়ে। সন্তানরা মায়ের পরিচয়েই পরিচিত হয় এবং বংশধারাও মায়ের বংশ অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়।

খাসিয়া

৪. পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার: খাসিয়াদের পোশাক-পরিচ্ছদ খুব সাধারণ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাসিয়া মেয়েরা নিজেদের তৈরি 'কাজিম পিন' নামক এক প্রকার ব্লাউজ এবং 'কা-জৈব-সম' নামে এক ধরনের সিল্কের তৈরি কাপড় লুঙ্গির মতো করে পরে। এর ওপর আবার কাপড়ের তৈরি এক ধরনের বেল্ট কোমরের উপর পরে, যা 'ফুংগ-মারুং' বলে পরিচিত। খাসিয়া পুরুষরা পরিধান করে এক ধরনের পকেটবিহীন জামা এবং লুঙ্গি। খাসিয়া নারীরা সোনার অলঙ্কার খুব পছন্দ করে এবং ব্যবহারও করে। আর পুরুষরা কেবল আংটিই ব্যবহার করে থাকে।

৫. ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ খাসিয়াদের ঐতিহ্যবাহী অনুষঙ্গের মধ্যে রয়েছে তাদের শিল্পকলা, নৃত্য, খেলাধুলা প্রভৃতি। খাসিয়াদের শিল্পকলার জুড়ি মেলা ভার। তারা নানা ধরনের জিনিস নিজেরাই তৈরি করে থাকে। যেমন-তারা বাঁশ দিয়ে কি কনুপ (মাথাল), কি 'কোহ' (ঝুড়ি), কা শানাস (বাক্স), কি সিল্লার (কাঁথা) ইত্যাদি তৈরি করে থাকে।

খাসিয়াদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অংশ হলো তাদের নৃত্য। তাদের প্রধান নৃত্যের নাম হলো 'নোংগোক্রেম' নাচ। খাসিয়ারা ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, দাবা ইত্যাদি খেলে।

খাসিয়া

৬. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ: খাসিয়ারা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে থাকে। তারা অনেক পূজা-পার্বণ করে। প্রায় প্রত্যেক পূজাতেই তারা ছাগল ও মোরগ উৎসর্গ করে। তারা প্রকৃতি ও জীবজন্তুরও পূজা করে থাকে। এ রকমই একটি পূজা হলো 'থামাও'। এখানে তারা ডিম ও চাল দিয়ে পূজা করে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করে। খাসি জনগোষ্ঠীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যবাহী উৎসব হলো সাড সুক মেনসিম উৎসব। এর অর্থ হলো 'হৃদয়ের আনন্দ নৃত্য'। ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে খাদ্যশস্যের অধিক ফলন, সম্পদ, সুস্বাস্থ্য এবং শান্তির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েই তারা এ নাচের উৎসবটি পালন করে থাকে। এসময় ঢোল যাকে খাসি ভাষায় বলা হয় 'কা-বম' এবং বাঁশি ও পাইপ যাকে খাসি ভাষায় বলা হয় 'তাংমুড়ি' ইত্যাদি বাজানো হয়। ভারতের মেঘালয় রাজ্যে এ উৎসবটি সবচেয়ে বৃহৎ আকারে পালিত হয়।

৭. খাসিয়াদের ভাষা খাসিয়াদের ভাষা হলো খাসি ভাষা। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের মনখেমের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এ ভাষা। খাসিয়াদের নিজস্ব কোনো লিপি নেই। ভারতে রোমান হরফের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। বাংলাদেশে সীমিত পর্যায়ে বাংলা হরফের ব্যবহার রয়েছে। খাসি ভাষার লিখিত রূপ না থাকার কারণে এদের প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে বান্ধারা এবং মুখে মুখে প্রচলিত প্রবচন এ ভাষায় খুব সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যময়। ভারতের মেঘালয়ে ভাষাবিজ্ঞানিগণ খাসি ভাষার ১১টি উপভাষার সন্ধান পেয়েছেন।

খাসিয়া

৮. খাসিয়াদের ধর্ম: খাসিয়ারা মূলত এক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রাচীন প্রথা ও নানা ধরনের সংস্কারই তাদের ধর্মের মূলভিত্তি। তারা প্রকৃতি পূজারি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির অন্তরালে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এবং প্রকৃতির আড়ালে দেবতা কিংবা অপদেবতার অস্তিত্ব বিদ্যমান বলে তাদের বিশ্বাস। তবে ব্রিটিশ আমল থেকে মিশনারিদের অনুপ্রেরণায় বর্তমানে তাদের মধ্যে ৯০ ভাগ মানুষই খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তারা পুনর্জন্মবাদেও বিশ্বাসী।"

৯. খাসিয়াদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: খাসিয়া সমাজে মৃতদেহ দাহ করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। তিনটি পাত্রে গরম পানি রেখে মৃতদেহকে গোসল করানো হয়। গোসল পরবর্তী সাদা কাপড় দ্বারা পেঁচিয়ে পাটিতে রাখা হয়। এ পাটিকে বলা হয় 'জিমপুং'। এরপর তাদের বিশেষ নিয়মনীতি পালনের মাধ্যমে শবদাহ করা হয়। যদি তাদের মধ্যে কেউ প্রবাসে মৃত্যুবরণ করে তবে তার আত্মীয়স্বজনরা তিনটি বা পাঁচটি কড়ি রাস্তার তেমাথায় রেখে মন্ত্র পাঠ করে এবং কড়িগুলোকে উক্ত মৃত ব্যক্তির শবদেহ কল্পনা করে দাহ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মতো খাসিয়াদের জীবনযাত্রাও অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। বর্তমানে শিক্ষার প্রসারে খাসিয়াদের সমাজে অনেক পরিবর্তন ও গতিশীলতা এসেছে। তাই তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

THANK YOU

মারমা বা মগ

মারমা বা মগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি

'মগ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে তা বলা সহজ নয়। কক্সবাজার অঞ্চলের শিক্ষিত মগরা নিজেদেরকে মগ বলে পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা নিজেদেরকে বার্মিজ বা আরাকানি বলে পরিচয় দিতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তবে আরাকানি বা বার্মিজদের মধ্যে মগ বলে কোনো জাতি নেই।

শিক্ষিত মগরা মনে করে যে, 'মগ' কথাটি বাঙালিদের দেওয়া এবং এর দ্বারা আরাকানি জলদস্যুদেরকে বোঝায়। বাংলাদেশে তারা 'মারমা' নামেও পরিচিত হয়। মগ-জলদুস্যদের অত্যাচারের কাহিনি বাংলাদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত। একদা হার্মাদদের প্ররোচনায় কিছুসংখ্যক আদিম আরাকানি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। তারা চট্টগ্রাম বা সীমান্ত এলাকার বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করত। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও তারা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু অবশেষে বাঙালিদের কাছে তারা পরাজিত হতে বাধ্য হয়। শিক্ষিত মগরা মনে করে, এসব জলদস্যুকে বাঙালিরা 'মগ' নামে অভিহিত করে। তবে এ সম্পর্কে অনেকে অনেক মত দেন। ফেইরী উল্লেখ করেছেন, 'মগ' কথাটি বিস্মৃত বাংলা শব্দ এবং সম্ভবত গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি 'মগধ' থেকে কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। চাক একটা বি১০

মারমা বা মগ

আবার ডি. জি. ই. হল বলেন, 'মগ' কথাটির আসল ব্যুৎপত্তি নির্ণয় অমীমাংসিতই থেকে গেছে। তিনি মনে করেন, এ কথাটির উদ্ভব ঘটেছে মঙ্গোলীয় বা মাঙ্গাল থেকে। কেননা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানবদের সঙ্গে মগদের চেহারাগত বৈশিষ্টের অনেক মিল রয়েছে। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান রাজ্য বার্মার অন্তর্ভুক্তির পর আভা সাম্রাজ্য ও চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শত্রুতা তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে শত্রুতার হিংসানলের শিকার হয় আরাকানে বসবাসরত মগ সম্প্রদায়। নিজ বাসভূমি বসবাস অযোগ্য হয়ে পড়ায় তারা পার্শ্ববর্তী রাজ্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তথ্যসূত্রে জানা যায়, ১৭৯৭খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার মগ চট্টগ্রামে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তাদের আশ্রয়দানের জন্য ব্রিটিশ সরকার এসময় তৎপর হয়ে ওঠে। ম্যাক ক্রিন্ডল মেগাসথিনিস-এর বিবরণী অনুসরণ করে উল্লেখ করেছেন যে, "গঙ্গার অপর পাড়ে পার্বত্য অঞ্চলে ব্রহ্মদেশীয় মাক্কোকালিঙ্গ নামে এক প্রকারের উপজাতি বাস করে তাদেরকেই মগ বলা হয়।" এভাবেই উপমহাদেশে মগ সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে।

১৯৬১ সালের আদমশুমারির সময় তাদেরকে মগ হিসেবে গণনা করতে তারা আপত্তি জানায় এবং মগের পরিবর্তে 'মারমা' ব্যবহার করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করে। সম্ভবত এ আপত্তির কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের মগ-অধ্যুষিত এলাকাকে মারমা অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মারমা বলতে আরাকানি বা ব্রহ্মদেশীয় অধিবাসী বোঝায়। এ কারণেই বাংলাদেশে মগর। 'মারমা' হিসেবে পরিচিত।

মারমা বা মগ

বসবাস

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় মারমারা অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। এছাড়া চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজার জেলা ও পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়া অঞ্চলেও কোনো কোনো স্থানে মারমাদের আবাসভূমি রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকার মারমারা আরাকানের অধিবাসী ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মারমারা তাদেরই বংশধর বলে অনেকে অনুমান করে। পটুয়াখালীর মারমাদের সম্বন্ধে জানা যায় যে, তারা ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে রেঙ্গুন থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল সুন্দরবন অঞ্চলে আবাদ করতে। পরবর্তীকালে তারা দেশে প্রত্যাবর্তন না করে পটুয়াখালীর গুলিয়াখালী থানার বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করতে থাকে। তাছাড়া খেপুপাড়া অঞ্চলে কিছুসংখ্যক মারমা আশ্রয় গ্রহণ করে। এখনও উক্ত অঞ্চলের নলুয়া, লমিচর, মুক্তির, চাপালি, খাপরাডাঙ্গা, মাধবি, নিশানবাড়ি এবং কুস্ত্রী গ্রামে কয়েক হাজার মারমা বসবাস করে।

মারমা বা মগ

নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

মারমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করা হয়। তাদের গায়ের রং ফর্সা এবং নাক কিছুটা চ্যাপ্টা। মারমাদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্য বিচার করে স্যার রিজলী বলেন, "এদের মধ্যে ৮৪.৫ জন মঙ্গোলীয় আকৃতির লোক দৃষ্ট হয়।" তাঁর এ মন্তব্যটিই সঠিক বলে মনে হয় এবং তারা যে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

একটি সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী, ত্রিপুরায় ১৯৫১ সালে মারমাদের জনসংখ্যা ছিল ৩,৭৮৯ জন, ১৯৭১ সালে তাদের জনসংখ্যা ছিল ১৩,২৭৩ জন। আর ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মারমাদের জনসংখ্যা ২,০২,৯৭৪ জন বলে জানা যায়।

মারমা বা মগ

মারমাদের সামাজিক জীবনধারা

মারমাদের সামাজিক জীবনধারা সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হলো-

১. বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা: মারমা সমাজে বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ উভয় রীতিই প্রচলিত আছে। তবে বেশকিছু সামাজিক বিধিনিষেধ সম্বন্ধে তারা বেশ সচেতন। কোনো গোত্রের সঙ্গে যদি মেয়ে বা পুরুষের নাম মিলে যায় তবে সেখানে বিয়ে হয় না। তারা অপর নৃগোষ্ঠী থেকে স্ত্রী গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু তাদের কোনো মেয়ে যদি নিজের ইচ্ছায় ভিন্ন নৃগোষ্ঠী থেকে স্বামী গ্রহণ করে তাহলে সামাজিক আইনে তা দূষণীয় নয়। তাদের সমাজে মেয়ের পছন্দেই সাধারণত বর ঠিক করা হয়। তবে রাজপরিবার বা শিক্ষিত পরিবারে বর নির্বাচন অভিভাবক বা পিতামাতার মত অনুযায়ীই হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট দিনে বর ও কনে যার যার বাড়িতে যথারীতি গোসল সেরে দেবতা 'চুমুংলে'-এর উদ্দেশে পূজা দেয় এবং রাত্রিতে স্বপ্ন দেখার উদ্দেশে খুব পবিত্রভাবে শয়ন করে। স্বপ্নের ভিত্তিতে শুভ-অশুভনির্ধারিত হয়। যেমন- নৌকায় স্রোতের অনুকূলে ভ্রমণ, সাদা বস্তু দর্শন, ফুল ও মালা অর্পণ করা ইত্যাদি শুভপ্রতীক। অপরদিকে, মরাগাছ ও শুকনো কাঠ দেখা, খালি কলসি দেখা, কান্নাকাটি করা ইত্যাদি অশুভ। স্বপ্নে ফলাফল শুভ হলে বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। বিয়ের দুদিন আগে বর ও কনেপক্ষ ক্ষমতানুসারে গ্রামসুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। উপযুক্ত মদ পরিবেশন, নৃত্যগীত এ অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। যেদিন বিয়ে হবে তার দুদিন আগে সন্ধ্যায় একটি শূকর, পাঁচটি মোরগ ও কিছু পান-সুপারি গৃহদেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়।

মারমা বা মগ

বিবাহকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর বর-কনেকে পূর্ব আয়োজিত খাবারের থালা দেওয়া হয়। খাওয়া শেষে তারা প্রথমে কনের পিতামাতা বা মুরব্বিদের প্রণাম করে। পরে তাদের সম্মানে আবার ভাত ভর্তি একটি থালা আনা হয়। একে 'মংগলা থালা' বলে। এ থালার ভাত সম্পূর্ণ খরচ করা ধর্মীয় রীতিবিরুদ্ধ। অবশিষ্ট ভাত মারমা সমাজে খুব পবিত্র বলে তা সংরক্ষিত হয়। বিয়ের পর সেই ভাত আনুষ্ঠানিকভাবে নৃত্যগীতের মাধ্যমে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়।

মারমা সমাজে পিতাই পরিবারের প্রধান। তারাই পরিবারের কর্তা। তাদের বংশ পরিচয়ও পিতার সূত্রেই নির্ণীত হয়। তবে পারিবারিক কাজে মাতাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

মারমা বা মগ

২. সামাজিক কাঠামো: মারমাদের সমাজে প্রধান হলেন রাজা। রাজাকে তারা ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। তাদের, সমাজব্যবস্থাও পুরুষতান্ত্রিক। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে পুরুষরা অনেকাংশে অপ্রধান হলেও গোত্রগুলো পুরুষ পক্ষকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। কেননা আদিমকালে বাসস্থান নির্মাণের ভার পুরুষদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। তাই মারমারা পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত।

৩. গোত্রব্যবস্থা: মারমাদের মধ্যেও গোত্র বিভাগ লক্ষ করা যায়। আবদুস সাত্তারের 'আরণ্য জনপদ' গ্রন্থে মারমাদের পনেরোটি গোত্রের কথা জানা যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রিগ্রাইস্তা, পালেংগস্তা, পালেংগ্রীস্তা, কাউকদিনস্তা, ভেইর্সেনস্তা, সারুংগস্তা, ফারানপ্রোস্তা, খিউকাপিআস্তা, ছেড়েংগস্তা, মারুত্তা, সাবোচ্চস্তা, ক্রংখিয়াংস্তা, তৈয়ংসিয়ট, খিয়কমাস্তে ও মাহলংস্তা। এসব গোত্রের সবাই পূর্বপুরুষদের বাসস্থানে নামের সঙ্গে পরিচিত এবং সে বাসস্থান নদী-তীরবর্তী অঞ্চল (খিংথা) কিংবা পর্বতসংকুল গহীন অরণ্যভূমি (টংথা)।

মারমা বা মগ

৪. পেশা: মারমারা কৃষিজীবী। তারা সাধারণত জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। জুম চাষের মাধ্যমে তারা নানারকম ফসল ও শাকসবজি ফলায়। জুম কাজে সহায়তার জন্য মেয়েরাও ছেলেদের অনুসরণ করে। মারমা সমাজে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি কর্মঠ এবং সাংসারিক কাজে তারাই সর্বাত্মক ভূমিকা রাখে। পুরুষদের অনেক সময় অলস জীবনযাপন করতে দেখা গেলেও মেয়েরা কখনো অলস জীবনযাপন করে না। জুম চাষ ছাড়াও তারা কাপড় বুনন ও চুরুট তৈরিতে দক্ষ। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তারা কাপড় ও চুরুট বাইরেও রপ্তানি করতে পারে।

মারমা বা মগ

মারমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা

মারমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা উপস্থাপনে যেসব বিষয় আলোচনা করা হবে সেগুলো নিচে উপস্থাপিত হলো-

১. সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ: মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, আশ্বিনী ও মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি উৎসব পালন করে থাকে। এছাড়া তারা খ্যাংসাং, চুংসংলে, ইংলেক, আবু গাকাইরে ইত্যাদি উৎসবও পালন করে থাকে। এসব উৎসবে তারা পূজা-পার্বণেরও আয়োজন করে। তারা মাঘ মাসের পূর্ণিমাকে বলে 'তাবুংলাব্রে'। সাংগ্রাই উৎসবের সময় তারা 'সাংগ্রাই আকা' নৃত্যগীতের আয়োজন করে। তারা একে আনন্দ নৃত্য বলে। এছাড়া 'ছিমুই খোয়ও আকা' বা 'প্রদীপ নৃত্য', 'সইং নৃত্য', 'লংবাই আকা' বা 'থালা নৃত্য' 'নে-সমুই' বা 'পরী নৃত্য', 'মাছ ধরা নৃত্য', 'বুলু' বা 'মুখোশ নৃত্য' মারমাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। তাদের সমাজে নানা ধরনের ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, রূপকথা, কিংবদন্তি ইত্যাদি প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে 'মনরি মাঁসুমি' রূপকথা এবং 'রিফংযাং' কিংবদন্তি এখনও লোকমুখে শোনা যায়।

মারমা বা মগ

২. ধর্মীয় বিশ্বাস: মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, সর্বশ্রেণির পাপ বর্জন, কুশলকর্মাদির অনুষ্ঠান, চিত্তের নির্মলতা সাধন-বুদ্ধদেবের এ অনুশাসনগুলোই তাদের ধর্মের মূলমন্ত্র। বৌদ্ধ দর্শনের সারমর্ম অনুযায়ী নির্বাণ লাভই তাদের উদ্দেশ্য। 'নির্বাণ' অর্থ 'নিবৃত্তি' মায়াময় সমস্ত প্রকৃতি থেকে নিবৃত্তি। অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মতো মারমাদেরও বিশ্বাস নিবৃত্তি অর্জন করতে পারলেই শান্তির পথ পাওয়া যায়।

প্রত্যেক পূর্ণিমাই তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। মাঘ মাসের পূর্ণিমা 'তাবুং লাব্রে' তাদের কাছে খুবই পবিত্র। কেননা এ সময় নাকি বুদ্ধদেব ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। মারমাদের অন্যতম প্রধান উৎসব 'থিঞ্জিয়ানা' এ সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। তাদের পূজা-পার্বণ 'রড়ি' দ্বারা পরিচালিত হয়। এ রড়ি হলো আমাদের দেশের উচ্চতর হিন্দুদের ঠাকুরের অনুরূপ। মারমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম হলো 'থাদুযুয়াং'।

৩. পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা: মারমা সমাজের মেয়ে-পুরুষ সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। তবে মেয়েরাই এ ব্যাপারে বেশি অগ্রণী বলে লক্ষ করা যায়। মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে লুঙ্গি ও এনিজ্যি প্রধান। বিয়ের সময় সাধারণত কনের জন্য এনিজ্যি ও বরের জন্য রেশমি লুঙ্গি পাঠায়। এছাড়া বরের জন্য একটি পাগড়ি বা গৌংবৌংও প্রেরিত হয়। এছাড়া মেয়েরা লুঙ্গি ও হাতাওয়ালা ব্লাউজ এবং পুরুষরা লুঙ্গি ও জামা পরিধান করে। মেয়েদের এ পোশাকই হলো 'এনিজ্যি'। মারমা মেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গয়না পরিধান করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। মারমা সম্প্রদায়ের মেয়েরা চুলের খুব যত্ন করে। মেয়েরা পুঁতির মালাও পরে।

মারমা বা মগ

৪. ভাষার ব্যবহার: মারমাদের ভাষা 'মগী' নামে খ্যাত। এটি আরাকানি ভাষায় সংমিশ্রণে গঠিত। এ ভাষা যে বার্মিজ ভাষা থেকে আগত এরও বেশ প্রমাণ রয়েছে। বর্তমানে মারমারা আধুনিক শিক্ষার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তাদের মধ্যে আর আদিম বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৫. খাদ্যাভ্যাস: মারমাদেরও প্রধান খাদ্য ভাত। তারা নানা পশুপাখির মাংসও খায়। উৎসব-অনুষ্ঠানে তাদের মধ্যে মদ খাওয়ার অভ্যাসও প্রচলিত আছে। মারমারা তরকারিতে নাপ্পি বা শুঁটকির গুঁড়া ব্যবহার করে। মরিচের চাটনি শুটকির গুঁড়া দিয়ে সুস্বাদু করা হয়।

মারমা বা মগ

৬. জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা: মারমা সমাজে কোনো সন্তানের জন্ম হলে তারা কয়েকদিন পর সে সন্তানের নাম রাখে। অনেক সময় জ্যোতিষীরা সন্তানের নাম রাখেন ও কোষ্ঠি তৈরি করে দেন।

মৃত্যুর পর মারমাদের মধ্যে মৃতদেহ পোড়ানো হয়ে থাকে। পোড়ানোর আগে তারা মৃতদেহকে গোসল করিয়ে নতুন কাপড় পরিধান করায়। এ দায়িত্ব নারী-পুরুষভেদে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। শবাচ্ছাদন করার পর মৃতদেহকে উঠানে স্থানান্তরিত করা হয়। এ সময় বন্দুক ছোঁড়া ও ঢাক-ঢোল পিটানো হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো লোকের মৃত্যু ঘটেছে। এছাড়া বন্দুক এবং ঢাক-ঢোলের আওয়াজ অশুভ দেবতাদের বিতাড়ন করে বলেও ধারণা করা হয়। অতঃপর বাঁশনির্মিত প্যাগোডাটাইপ গাড়িতে করে লাশ চিতাঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। এ গাড়িতে দুপাশে দুটি করে মোটা দড়ি বাঁধা থাকে এবং দুদল লোক সেই দড়ি ধরে বিপরীত দিকে টানতে থাকে। যে দল জয়লাভ করে সেই দলভুক্ত লোকেরাই মৃতদেহ পোড়াবার অধিকার পায়। এ দুই দলের এক দল স্বর্গপক্ষ ও অপর দল নরকপক্ষ অবলম্বন করে। সাধারণত এ প্রতিযোগিতায় স্বর্গ পক্ষাবলম্বীরাই জয়লাভ করে। মৃতদেহ দাহ করার পরদিন তারা হাড় ও ছাই কুড়িয়ে এনে মাটিতে পুঁতে রাখে বা ছাই নদীবক্ষে নিক্ষেপ করে। মারমাদের মৃতদেহ চিতাঘাটে নেওয়ার সময়ও ঢোল-ডগরা বাজানো হয়ে থাকে। পোড়ানোর পূর্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মন্ত্র পাঠ করে থাকেন।

THANK YOU

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

কোচ

কোচ নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি

কোচরা নিজেদের কুচবিহারের নৃপতি নরনারায়ণ এবং চিলারায়ের বংশধর হিসেবে পরিচয় দেয়। তাদের মতানুযায়ী তাদের আদি নিবাস ছিল রাসান মৃকপ্রাক টানি অথবা উদয়গিরি নামক স্থানে। এ আদি নিবাস ছেড়ে তারা প্রথমে কামরূপ এবং পরে হাজো অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পরশুরামের অত্যাচারে তারা সে স্থানও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারা বিশ্বাস করে, সূর্যদেবতার দুই কন্যা মুকদী এবং কুণ্ডী তাদের আদি মাতা এবং তাদের পিতা রাজা হাজো এবং পরশুরামের ভয়ে হাজো অঞ্চল পরিত্যাগ করে কোচেরা সোনাপুর নামক স্থানে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে তিতিলি হাচেং নামক স্থানে পৌছায়। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারণে তারা উক্ত স্থানও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পরে তারা খাসি পাহাড়ের সংলগ্ন কুসুমবালা নামক স্থানে সাময়িকভাবে বসবাস করে। অতঃপর তারা গারো পাহাড়ে প্রবেশ করে এবং রংজেং নাম স্থানেও সাময়িকভাবে অবস্থান নেয়। এর কিছুদিন পরে তারা উক্ত স্থানও পরিত্যাগ করে এবং মেঘালয়ের পশ্চিমে সমভূমি - এলাকায় পৌঁছায়। পরবর্তীতে সেখানকার এক পরাক্রমশালী নেতার উদ্যোগে সেখানে একটি কোচ রাজ্য গড়ে ওঠে। এ রাজ্যই পরবর্তীকালে 'কুচবিহার' নামে পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

কোচ

বসবাস ও জনসংখ্যা

'বৃহত্তর ময়মনসিংহের শেরপুর জেলার উত্তর সীমান্তবর্তী ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে ঝিনাইগাতি, নালিতাবাড়ি ও শ্রীবরদীর ২২টি গ্রামে প্রায় ৩ হাজার কোচ জনগোষ্ঠী বসবাস করে। অধিকাংশ কোচ জনগোষ্ঠী ভারতের আসাম ও *মেঘালয়ে বসবাস করে। বাংলাদেশের কোচ সমজাতীয় বর্মণ নামের অধিবাসীরা নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, -গাজীপুর ও বরেন্দ্র অঞ্চল, উত্তরাঞ্চলের পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলায় -বসবাস করে।

উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী কোচরা কোচ পদবির পাশাপাশি ইদানীং তারা গোষ্ঠীর পদবি নামের শেষে বর্মণ, রায়, সরকার ইত্যাদি ব্যবহার করে। রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট ও নওগাঁর অনেক স্থানে কোচদের ঘনবসতিপূর্ণ পল্লি দেখা যায়। এছাড়া আত্রাইয়ের অদূরে বড়ছিতে বহু পুরনো কোচপাড়া রয়েছে। পাবনার জনাকীর্ণ এলাকা, জয়পুরহাট শহরের উপকণ্ঠে শঙ্খ নদীর অদূরেও কোচ সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

কোচ

নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

কোচদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় নির্ণয়ে একেকজন নৃবিজ্ঞানী একেক রকম মতামত ব্যক্ত করেছেন। হার্বার্ট হোপ রিজলি মূলত রাজবংশীদেরকে কোচ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদেরকে দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত মঙ্গোলীয় মিশ্রণে অবিমিশ্র বলে মনে করেন। তার মতোই উনবিংশ শতাব্দীর আরও অনেক গবেষক ও লেখক কোচ ও রাজবংশীদের একই নৃগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে দেখেছেন। ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামন্টন বলেছেন, নৃকুল বিদ্যার (Ethnology) বিচারে কোচ, গলিয়া এবং রাজবংশীরা একই জাতের। জে. এস. ভাস বলেন, রংপুর জেলার কোচ ও রাজবংশীরা একই নরগোষ্ঠী থেকে এসেছে। এ জাতিগুলো স্পষ্টত মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। ব্যাপক আন্দোলন ও সংগ্রামের পর ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে রাজবংশীরা আলাদা নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অপরদিকে কতিপয় গবেষক ধারণা করেন, গাঙ্গেয় উপত্যকা তথা পশ্চিম ও দক্ষিণে রাজবংশীরা দ্রাবিড়ভাষী ইন্দো-ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীভুক্ত এবং উত্তর ও পূর্বের কোচরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত।

একটি সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী জানা যায়, ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে বসবাসরত কোচ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার ৯০৩ জন।

কোচ

কোচদের সামাজিক জীবনধারা

কোচদের সামাজিক জীবনধারার সাথে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিষয়গুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো-

১. সামাজিক কাঠামো কোচ সমাজে গ্রাম্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে। তাদের গ্রামের প্রধানকে বলা হয় মণ্ডল। আর সহকারী হিসেবে থাকেন সেন। বিচার-সালিসের কাজে মণ্ডলকে সহায়তা করার জন্য সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় পরিষদ। গ্রাম্য সামাজিক পরিষদের সিদ্ধান্তই কোচ সমাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাদের মধ্যে কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে তারা নিজেরাই সামাজিকভাবে তার সমাধান করে নেয়। তাদের সমাজের প্রধান ব্যক্তির (মণ্ডলের) মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার বলে তার বয়োজ্যেষ্ঠ সন্তানকে মণ্ডল নিয়োগ করা হয়। তবে তার পূর্বপুরুষের পিতামাতার বিবাহ সামাজিকভাবে অনুষ্ঠিত না হলে পাপী সন্তান বলে সে সমাজে গণ্য হয়। এমন ব্যক্তি সমাজের প্রধান ব্যক্তি বা সমাজের কোনো পবিত্র অনুষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারেন না।

কোচ

২. বিবাহ প্রথা কোচ সমাজে পিতামাতার পছন্দমতোই বিবাহের সম্বন্ধ করা হয়। কোচ পরিবারে মেয়েদের প্রভাব ছিল বলেই আগে প্রায় ছেলেরা ঘরজামাই থাকত। তবে আগের মতো আর নেই। কোচ সমাজে সাধারণত দুই ধরনের বিবাহ প্রচলিত। এগুলো হলো-

ক. জাত বিয়া: এটি হচ্ছে স্বাভাবিক বৈধ পদ্ধতি, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং সামাজিকভাবে অনুমোদিত।. এ ধরনের বিয়েতে বিয়ের বয়স প্রাপ্ত ছেলে অথবা মেয়ের সন্ধান পেলে সেখানে নিজেরা সরাসরি না গিয়ে লোক মারফত বা ঘটকের দ্বারা বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয়।

খ. পাপমান্নি বিয়া: কোচ ভাষায় 'পাপ' মানে 'দোষ' এবং 'মান্নি' মানে 'পাওয়া'। এর অর্থ হলো সামাজিক দৃষ্টিতে দোষী হওয়া। কোচ প্রথা অনুসারে বৈধ নিয়মে বিবাহবহির্ভূত কোনো নারী-পুরুষ একত্রে বসবাস করতে পারে না, এমনকি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে স্পর্শও করতে পারে না। যদি কোনো অবিবাহিত যুবক-যুবতী পরস্পর ভালোবেসে অন্যত্র পালিয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে নিজ গ্রামে ফিরে এসে অভিভাবকদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন পাপমান্নির নিয়মানুযায়ী তাদেরকে সমাজে আশ্রয় দেওয়া হয়।

কোচ

উপরিউক্ত দুই ধরনের বিবাহরীতি ছাড়াও আরও একটি বিবাহ ব্যবস্থাও প্রচলিত রয়েছে কোচ সমাজে সেটি হলো-

পাপাই কাকান বিয়া: কোচদের মধ্যে একই নিকিনী বা মাহারীতে কোনো অবিবাহিত যুগল ভালোবাসার মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্কে আবদ্ধ হলে তাকে 'পাপাই কাকান পাপি' বলে গ্রহণ করা হয়। তাদেরকে সমাজচ্যুত করা অথবা ক্ষেত্রবিশেষে তাদের অভিভাবকদেরও সমাজচ্যুত করা হয়। এটি গর্হিত কাজ বলে তাদেরকে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমান সমাজে অর্থদণ্ড দিয়ে অথবা অবস্থার ভিত্তিতে এর সমাধান করা হয়। কোচ সমাজে এটি সবচেয়ে ঘৃণিত প্রথা এবং এটিই পাপাই কাকান পাপিদের বিয়ে।

কোচদের মধ্যে বর্তমানে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে আইরো দিয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। তারা বিয়েতে মাছ, ছাগল ও কচ্ছপ বলিদান করে। বর ও কনের পরিবারে ভোজের আয়োজন করলে গ্রামের প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা প্রায় সবাই চাল, আলু, গুড় ও মদ নিয়ে বাড়িতে আসে। কোচ রমণীরা অতিথিদের আপ্যায়ন করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে। তারা চিড়ামুড়ি, খই, চা ও মদ দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করে থাকে। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের বিয়ের আগেই ডাকা হয়।

আশির দশকের পর থেকে তাদের সমাজে যৌতুক প্রথার প্রচলন ঘটেছে এবং হিন্দুরীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে খরচও অনেক বেড়ে গিয়েছে।

কোচ

৩. পরিবার ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা: কোচদের পরিবারে পিতাই প্রধান ব্যক্তি এবং তিনিই পরিবারের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। বর্তমানে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। কোচ পরিবারে মেয়েদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলেই সন্তানদের বংশমর্যাদা বা বংশ পরিচয় মায়ের দিক থেকে হয়। তবে বাবার অনুসারী বংশমর্যাদা নির্ণীত হয়ে থাকে। যাদের বংশধারা মায়ের অনুযায়ী হয় তারা মায়ের নিকিনী বা মাহারী গ্রহণ করে। বর্তমানে মেয়েদের ১৫ থেকে ১৬ বছর বয়স ও ছেলেদের ২২ থেকে ২৩ বছর বয়সেই প্রায় বিয়ে হচ্ছে এবং ছোট ছোট আলাদা পরিবার বা সংসার গড়ে উঠছে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মায়ের নামে সম্পত্তি থাকলে মেয়ে পায় এবং বাবার নামে সম্পত্তি থাকলে ছেলেরা পায়। বাবা ইচ্ছা করলে তার মেয়েদেরকে কিছু দিয়ে দিতে পারে।

কোচ

৪. গোত্র, গোষ্ঠী ও শ্রেণিবিভাগ: কোচ সমাজে দুটি গোত্র পাওয়া যায়। এগুলো হলো- আজোম ও সিংহাং। যেসব নিকিনী বা মাহারী 'কাকমাঞ্চি' পূজায় ছাগল মানত করে বলিদান করে এবং ঘরের ভিতর এক কোণে পূজা করে তারা হলো আজোম গোত্রের, আর যে সকল নিকিনী/জুঘু বা মাহারী ছাগল পাঁঠা বলিদান করে এবং ঘরের ভিতর পূজা না করে বাইরে পূজা করে তারা হলো সিংহাং গোত্র।

কোচ সমাজে অনেকগুলো নিকিনী/জুঘু বা মাহারী রয়েছে। কোচ জাতি আটটি শ্রেণিতে বিভক্ত বলে জানা যায়। এগুলো হলো- ১. তিন টেকিয়া কোচ, ২. মার্গান বা দশগাঞা কোচ, ৩. চাগ্রা কোচ, ৪. বানাই কোচ, ৫. ওয়ানাং কোচ, ৬. সাতপারি কোচ ও ৭. শংকর কোচ। এদের মধ্যে ভাষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলাদেশের শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী তিন শ্রেণির কোচ পাওয়া যায়। এগুলো হলো- তিনটেকিয়া কোচ, মার্গান কোচ ও চাপ্রা কোচ। কোচদের নিকিনী/জুঘু বা মাহারী অনেকগুলো। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- দম্বা, কামাকসো, হাচুক, ওয়ানাং, কামা, তেলাং, দংচা, দিতিলা, চারু, দাচুং, বার্মা, কৌমদা, তাভা, হাচাম, চিকু, নালা, বরদাক, হাজং ইত্যাদি।

কোচ

৫. জীবিকা নির্বাহ পদ্ধতি/পেশাভিত্তিক ব্যবস্থা: কোচদের পেশাভিত্তিক ব্যবস্থা মূলত কৃষিভিত্তিক। একসময় পশুপালন ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ পেশা। তারা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, কবুতর, কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য পাখি লালন-পালন করত। কোচ সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েই কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে। বর্তমানে কোচদের মধ্যে কেউ কেউ কৃষিকাজে দিনমজুরির কাজ করছে। এছাড়াও কেউ পাথর তোলা, পাথর ভাঙা ইত্যাদি কাজও করছে। এর পাশাপাশি তারা বন-জঙ্গল থেকে লাকড়ি ও বাঁশ নিয়ে এসে বাজারে বিক্রি করেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আবার নারীরা বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঢোল, কুলা, চালুন, জামা, পাটি ইত্যাদি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেও অর্থ আয় করে সংসার পরিচালনায় সাহায্য করছে।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

কোচ

কোচদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা

কোচদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১. সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠান: কোচদের প্রধান উৎসবগুলো হচ্ছে- বৈশাখী বাস্তু ও কালী পূজা, আষাঢ় আর্মতি, যাত্রাগাছা, লক্ষ্মীবাড়ি, মারাবাতি, মাই আক্কানি, মাইপিদানছানি পৌষণাপিঠা বা নবান্ন, আবির খেলা ও চৈত্র সংক্রান্তি। বাস্তু ও কালীপূজার সময় প্রায় প্রতিটি পরিবারই ছাগল বলি দিয়ে থাকে এবং ওই দিন নিকটাত্মীয়দেরও আগমন ঘটে। যাত্রাগাছা হলো দেবী দুর্গার বিসর্জনের দিন। এদিন চিড়া, মুড়ি, খই ও নারিকেল দিয়ে প্রসাদ তৈরি করা হয়। লক্ষ্মীবাতির দিন কেউ কেউ ব্রাহ্মণ দিয়ে মূর্তিপূজা করে থাকে। কোচপাড়া ও মহল্লায় রমণীদের উলুধ্বনি ও রাতে কোজাগর খেলায় মুখরিত থাকে গোটা কোচ এলাকা। আর 'মাই আকলানি' হলো নতুন ধানকে স্বাগতম দিয়ে নিয়ে আসা। মাইপিদানছানি বা নবান্ন উৎসবটা কোনো নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী হয় না। সমাজের লোকেরা কোচ পাড়াতে নিজেদের সুবিধামতো প্রতিটি পরিবার নবান্ন উদ্যাপন করে। পৌষ মাসের শেষ দিন তারা সবাই মিলে পিঠা, পায়েশ খায় এবং ধূমধাম করে উৎসব উদ্যাপন করে। এভাবেই কোচদের প্রায় সারা বছরই উৎসবমুখরতায় কাটে।

কোচ

২. বাসস্থানের ধরন: গারো পাহাড়ের সীমান্তবর্তী কোচদের পাহাড় থেকে আসা ঝরনা, ছড়া বা ছোট নদীর ধারে জলাশয় অঞ্চলে বসবাস ছিল। পাহাড় থেকে কাঠ, বাঁশ, শন সংগ্রহ, ঝরনা বা ছোট নদীর পানিতে অথবা হাওর বা বিলে গোসল করা, থালা-বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া, গরু-বাছুরের পানি দেওয়া ইত্যাদি সুবিধা দেখেই এসব অঞ্চলে তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এদের ঘরবাড়িগুলো খড়, বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। তবে সময়ের পরিবর্তনে এখন তাদের প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই রয়েছে মাটির দেয়াল, ঘরবাড়িগুলো প্রায় মাঝারি ধরনের। কোচদের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই বিশেষ করে দুটি ঘর থাকে শোয়ার ঘর ও গোয়াল ঘর। তাদের শোয়ার ঘরের সামনে নিচু করে বারান্দা রাখা হয় এবং সেখানে রান্নাবান্না হয়। কতিপয় পরিবারের যুবক ছেলেরা পাড়াতে বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক ছেলের বাড়ি কাচারি ঘর তৈরি করে সেখানে রাতে ঘুমায় এবং আড্ডাও দেয়। এ ঘরকে কোচ ভাষায় বলা হয় 'দেকাদেনি কাচা নক'। আর বাড়ির চারদিকে বাঁশ খুঁটি দিয়ে ঘের দিয়ে রাখা হয়। উঠানের এক পাশে খড় দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটি দেব মন্দিরও দেখা যায়। এ মন্দিরটি 'কানিওয়াই নক' বা মনসা দেবীর। মন্দিরের নিকটে তুলসি গাছ ও বিভিন্ন প্রকারের ফুলের গাছ থাকায় কোচ পরিবারের ঘরগুলো সকলকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

কোচ

৩. ধর্মীয় বিশ্বাস: কোচ সম্প্রদায়ের লোকেরা সনাতন ধর্মাবলম্বী ও প্রকৃতিপূজারি। তারা তন্ত্রমন্ত্র, পূজা-পার্বণ, দেও- দেবতার ওপর অত্যন্ত বিশ্বাস করে। কোচদের দেও-দেবতার মধ্যে রয়েছে- লাম ওয়াই (রাস্তার দেবাত), হাজং বুড়ি (নিত্যপ্রয়োজনীয় লোহার সরঞ্জাম), আন্দাহুরা (পথভোলা), বারুমখোলা (মাথার ঘা হওয়া), হুদুম ওয়াই (হাত, পা, শরীর ব্যথায় ফুলে যাওয়া), ওয়াচেং ফেলি বা বাঙ্গাল ওয়াই (হঠাৎ করে পেট ব্যথা), হলাই বুড়ি (শিশু কান্নাকাটি করা), নিগামানি ওয়াই (মুখে রুচি করা), কাকসাঞ্চি (বংশ ও গোত্র রক্ষা করা), গাসুম ওয়াই (জীব-জানোয়ার থেকে রক্ষা পাওয়া), মুইলা ওয়াই (সন্তান জীবিত রাখার জন্য) ইত্যাদি পূজা তারা অনেকদিন ধরে পালন করে আসছে। এসব দেও-দেবতার প্রতি মানত করে তারা ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, কবুতর, কচ্ছপ, মাছ রাস্তাঘাটে বলি দিয়ে থাকে।

এছাড়াও কোচরা বছরে বিভিন্ন ঋতুতে নানা পূজা-পার্বণের আয়োজন করে। এসব পূজার মধ্যে রয়েছে- কানি ওয়াই, নিকিনী ওয়াই, ওয়াই মাগাইনি, চড়াবুড়ি, লষ্ঠাই ওয়াই, নাছাডি দিকিৎছানি ওয়াই ইত্যাদি। কোচ সমাজে কাকমান্ডি ওয়াই পূজাই ছিল প্রধান পূজা। তারা একক পরিবারেই পূজা করত। তবে কোচ সমাজে প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লাতে বৈশাখ মাসে বাস্তুপূজা ও কালী পূজা-পার্বণগুলোতে ভাতের তৈরি মেরা বা মদ দিয়ে উৎসর্গ করা হয়। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আচার-প্রথা অনুযায়ী কেউ কেউ সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, গণেশ পূজা প্রভৃতি পূজা উদ্যাপন করছে। মনসা দেবী (কানি ওয়াই) তাদের পারিবারিক দেবী হিসেবে বিবেচিত হন।

কোচ

৪. পোশাক-পরিচ্ছদ: প্রতিটি কোচ পরিবারই বস্ত্র বুননে পারদর্শী। কোচ নারীরা বংশপরম্পরায় ঘরে বসে নিজ হাতে বানা বা হাতল তাঁতে তৈরি করে থাকে। কোচ নারীরা যে কাপড় পরিধান করে তাকে বলা হয় 'লেফেন'। তাদের সমাজে নিজেদের তৈরি ও ব্যবহৃত বিভিন্ন কাপড়ের মধ্যে রয়েছে- আংগরছকা, ওয়াকচু ছকা (ওড়না), পাছড়া ছকা ও কানছকা ইত্যাদি। কোচরা কাপড়ে ফুল, ফল, পাখি, মাছ, প্রজাপতি প্রভৃতির নকশা বেশি অঙ্কন করে থাকে। কোচ বিধবা নারীরাও সাদা মার্কিন জাতীয় কাপড় তাঁতে বুনন করে বুকে পরিধান করে। কোচ ছেলে বা পুরুষরা গামছা, ধুতি, লুঙ্গি, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবি, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করে। তবে বর্তমানে কোচ নারীদের আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সালোয়ার-কামিজ, মেক্সি, শাড়ি ইত্যাদি পরিধান করতে দেখা যায়।

৫. অলঙ্কার: কোচ নারীরা অলঙ্কার পরতে খুব পছন্দ করেন। তারা এক সময় অনেক অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। গলায় পরতেন দাঙ্গা বিচি লোক, হারছরা, হাসুনি ও জাত শিকুল। এগুলো বানানো হতো ধাতুর মুদ্রা দিয়ে। কানে পরতেন কানফুল, ছানিকানফুল, করমফুল ও ননাবেনতা। হাতে পরতেন কাতাবাজু, বইলা ও শাংকি। পায়ে পরতেন শিংনাপুর ও কোমরে পরতেন শিংলেবক। তবে এখন সেদিন বদলে গেছে। বর্তমানে এসব অলঙ্কার কোচ রমণীদের খুব বেশি একটা পরতে দেখা যায় না। তবে বিয়ের সময় কনেকে এসব অলঙ্কার পরতে দেখা যায়।

কোচ

৬. খাদ্যাভ্যাস: কোচদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত ও শুকনা শুঁটকি মাছ। তারা শুঁটকির দ্বারা খাবার সোডা দিয়ে তরকারি রান্না করে। কচি বাঁশের করুল, লতাপাতা, উদ্ভিদ জাতীয় মাশরুম ও সবজিজাতীয় আলু, বেগুন, লাউ, কুমড়া, পেঁপে ইত্যাদি শুঁটকি মাছ দিয়ে রান্না করা হয়। যদি কোনো আত্মীয়স্বজনের আগমন ঘটে তবে তাদের জন্য রান্না করা হয় টকপাতা (মান্দালেচাক জাবা) ও চালের আটার ডাল (কাপ জাবা) দিয়ে মাছ অথবা মাংস। তারা খরগোশ, বন্য শূকর, সজারু, বন্য মোরগ ইত্যাদি শিকার করে এবং এদের মাংসও খায়। বিন্নি ধানের ভাত (ডিংগাইনি) সিদ্ধ করে চ্যাপা শুঁটকি মাছ, মরিচ, পেয়াজ, রসুন কলাপাতায় মুড়িয়ে আগুনে পোড়ানো হয় এবং 'নাছাই জাগু পাতাউনি' নামে এক ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। এটি তাদের প্রিয় খাবার। ভাতের তৈরি মেরা বা মদ প্রায় সবাই পানাহার করে। মেরার সাথে তারা 'খাজি' খেতে পছন্দ করে। এটি হলো শুঁটকি মাছ ও চাল গুঁড়া করে শাকসবজি দিয়ে আগুনে ভাপ দিয়ে তৈরি করা এক ধরনের খাবার। একে কোচ ভাষায় বলা হয় 'কাথামুড়ি'।

কোচ

৭. ভাষার ব্যবহার: কোচদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। ভাষাবিদদের মতে কোচ ভাষা তিব্বতি-বর্মী ভাষা পরিবারভুক্ত। তবে কোচ ভাষায় অহমিয়া, বাংলা, গারো প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। হডসন নামক ভাষাবিজ্ঞানীর মতে, কোচদের ভাষা বাংলা, উড়িয়া, গণ্ড, হিন্দি, অহম ও ছোট নাগপুরী ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। আদি কোচদের ভাষার সঙ্গে হাজং ও অহমদের ভাষার কিছু কিছু মিল পরিলক্ষিত হলেও উচ্চারণে বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। আবার গারোদের আত্তং গোত্রের ভাষার অনেক শব্দসহ নামপাদের মিলও কোচদের ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বর্তমান প্রজন্মের কোচরা কোচ ভাষা বলতে পারে না। বাংলা ভাষার প্রভাবে তাদের ভাষা অনেকাংশেই বিলুপ্তির পথে। তাই এদেশে বসবাসকারী কোচদের ভাষা এখন বাংলা।

কোচ

৮. জন্মক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা: কোচ সমাজে কেউ যদি সন্তান প্রসব করে, তবে ওই পরিবারসহ বংশের লোকেরা অত্যন্ত খুশি হয়। মেয়ে শিশুর জন্মেও তারা সমান আনন্দিত হয়। কেননা মেয়েরাই মায়ের নিকিনী বা বংশ বা গোষ্ঠী পরিচয় বহন করে। অনেক ক্ষেত্রে মা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর পরই কবিরাজের তাবিজ পরিয়ে দেওয়া হয়। অসুস্থতায় ঝাড়ফুঁক ও জলপড়ার ব্যবস্থা করে। প্রসবের জন্য আলাদাভাবে উঠানের মাঝে চালাঘর নির্মাণ করা হয়। শিশু জন্মের ১৩ দিন পর নাপিত দিয়ে শিশুকে খেওড়ি করা হয়। আর ২১ দিন পর ব্রাহ্মণ দিয়ে 'সুর ঝাড়া' দেওয়া হয়। শিশুকে আদর করে দাদা-দাদিরা নিজের ভাষায় নাম দেন। শিশুদেরকে নারীরা সবসময় কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে পিঠে বা কোলে বেঁধে রাখে। আবার কখনো বারান্দার খুঁটির সাথে দুই পাশে কাপড় বেঁধে দোলনা বানিয়ে ঘুমপাড়ানো হয়।

THANK YOU

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

রাখাইন

রাখাইনদের উৎপত্তি

আরাকানের মঙ্গোলিয়ানদের ভোট-বর্মী সম্প্রদায় থেকে রাখাইনদের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ থেকে শেষ দশক পর্যন্ত আরাকান অঞ্চলটি বিদ্রোহ, হত্যা আর ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বমুখর এক বিপর্যস্ত রাজ্য ছিল। এ শতাব্দীর শেষদিকে অমাত্যবর্গের চক্রান্তে বিপন্ন আরাকানরাজ যামাদা কর্মী রাজ রোধপীয়ারের কাছে পরাজিত হলে বর্মীরা আরাকান দখল করে এবং তাদের সেনারা অসংখ্য নারী-পুরুষ গ্রেফতার করে। এর মধ্য দিয়ে তারা স্ত্রীলোকদেরকে ধরে বার্মা পাঠায় এবং পুরুষদের হত্যা করে। এভাবে আরাকানিরা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হতে থাকে। প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তারা নিজেরাই নিজেদের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে সপরিবারে সীমান্ত অতিক্রম কবে চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদেরকে পুনর্বাসিত করে নিজেদের স্বার্থপূরণ করতে চাইলেও তাদের একটি দল এখান থেকে রক্ষা পেতে আরাকান, বার্মা বা চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে এসে সরাসরি পটুয়াখালীতে আশ্রয় নেয়।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

রাখাইন

আবার এটাও জানা যায় যে, ১৭৮৪ সালে আরাকানের মেঘবতী থেকে ১৫০টি রাক্ষাইন পরিবার বর্মী নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে ৫০টি নৌকাযোগে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে তিন দিন তিন রাত পর বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী দ্বীপে উপনীত হন। জনমানবহীন এবং শ্বাপদসঙ্কুল এ সমুদ্রদ্বীপ পরিষ্কার করে তারা এখানে তাদের সঙ্গে আনা ধান বীজ ও অন্যান্য ফলমূলের বীজ বপন করে এবং বসবাস শুরু করে। এর পর্যায়ক্রমে তারা তাদের বোমাগ্রীবা বোমাং প্রধান কংহলা পাইলংখং প্রধান ম্রাচাইয়ের নেতৃত্বে রাক্ষাইনরা যথাক্রমে বান্দরবান ও মানিকছড়িতেও বসতি গড়ে তোলে।

রাখাইনদের নামের ইতিহাস নিয়ে অনেক দ্বিমত আছে। তারা মিয়ানমার আরাকান অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ায় তারা স্বদেশকে 'রক্ষাইঙ্গী' এবং নিজেদেরকে 'রাক্ষাইন' নামে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করত। তাদের বাসভূমিকে তারা 'Rakhaing Pyi' নামে চিহ্নিত করে। ধারণা করা হয়, 'রাখাইন' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'রক্ষা' ও 'রাক্ষাইন' এ দুটি পালি শব্দ থেকে যার সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে 'রক্ষণশীল জাতি'। তাই ধারণা করা হয় 'রক্ষা' শব্দ হতেই 'রাক্ষাইন' শব্দের উৎপত্তি হয়। তারা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ব্যাপারে রক্ষণশীল বলেই তাদের নাম 'রাখাইন' রাখা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

রাখাইন

রাখাইনদের বসবাস

বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়ের অধিকাংশেরই বসবাস পটুয়াখালী জেলায়। এছাড়াও কক্সবাজার, বরগুনা, রামু, বান্দরবান, মানিকছড়ি, মহেশখালি এবং টেকনাফেও রাখাইনদের বসবাস রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, বাংলাদেশে রাখাইন অধিবাসীদের সংখ্যা ১৩,২৫৪ জন। তবে বর্তমানে এদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

রাখাইন

রাখাইনদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

রাখাইনদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় তাদেরকে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নৃতাত্ত্বিক গবেষণানুযায়ী তাদের অধিকাংশই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সদস্য। রাখাইনদের মাথা গোলাকার, নাক চ্যাপ্টাকৃতির, গায়ের রং উজ্জ্বল বাদামি বর্ণের, চুল কালো এবং উচ্চতা মাঝারি। তবে কারও কারও গায়ের রং ঈষৎ শ্যামলাও হয়। তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিচারে নৃবিজ্ঞানীরা তাদেরকে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর সদস্য বলেই বিবেচনা করেছেন।

রাখাইন

রাখাইনদের সমাজব্যবস্থা

রাখাইনদের সমাজব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয় আলোচনা করা হবে সেগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো-

১.সামাজিক সংগঠন বা পাড়া ব্যবস্থা: রাখাইনদের সমাজব্যবস্থা পূর্ণ গণতান্ত্রিক। রাখাইন পাড়াগুলো বিভিন্ন ব্যক্তির নামে গড়ে ওঠে। রাখাইন সমাজের দানশীল ব্যক্তি বা নেতাদের নামানুসারে তাদের পাড়ার নামকরণ করা হয়। পাড়ার নেতা বা মাতবর নির্বাচিত হন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে। পাড়ার সকল পুরুষ একত্রিত হয়ে ভোটদানের মাধ্যমে পাড়ার নেতা বা মাতবর নির্বাচন করেন যাকে তারা 'হেডম্যান' বলে থাকেন। এ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীদের কোনো ভূমিকা থাকে না। তাদের ভোট দান করার কোনো ক্ষমতা নেই।

রাখাইন

২. বিবাহ ব্যবস্থা: রাখাইন সমাজের বিবাহব্যবস্থার সাথে আধুনিক সমাজের বিবাহব্যবস্থার সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাদের মধ্যে সাধারণত ফসল তোলার মৌসুমে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। ছেলেদের পক্ষ থেকেই মেয়েদের খোঁজ করা হয়। মেয়ে নির্বাচিত হলে ছেলে পক্ষ মুরব্বি বা পাড়ার প্রধান বা সম্মানিত কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে মেয়ে পক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠান। মেয়ে পক্ষের যদি প্রস্তাব পছন্দ হয় তবে তারা ছেলেপক্ষকে আলোচনা ও বাগদানের জন্য খবর পাঠায়। ভালো দিন-তারিখ দেখে পাড়ার মাতবর, মুরব্বি, আত্মীয়স্বজন, ছেলে ও বন্ধু সবাই মেয়ের বাড়িতে যায়। আংটি পরানোর মাধ্যমে তাদের বাগদান সম্পন্ন হয়। এরপর পুরোহিত ডেকে পত্রিকা দেখে বিয়ের শুভ দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। উভয় পক্ষ থেকে ছেলেমেয়েকে সেসব জিনিস দেওয়া হবে তার হিসাবও এসময় করা হয়। মেয়ের বাড়িতেই হয় বিয়ের প্রধান আয়োজন। পাত্র পক্ষ বাজি ফুটিয়ে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কনের বাড়িতে আসে। এ সময় পাত্রপক্ষ ঐতিহ্য অনুযায়ী বরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাথে একটি লম্বা দা, পাখা, তামাক, খাবার পাইপ ইত্যাদি সাথে নিয়ে আসে। এরপর ধর্মীয় বিধান মোতাবেক বিয়ে হয়। তাদের বিবাহে ধর্মীয় বিধান পালন অপরিহার্য শর্ত। বৌদ্ধ ভিক্ষু মঙ্গলসূত্র পাঠ করে বিবাহ পড়ান। তাদের মধ্যে যৌতুক প্রথা নেই।

রাখাইন

৩. পরিবার ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার প্রথা: রাখাইনদের পরিবার হলো পিতৃতান্ত্রিক। তাদের পরিবার কাঠামোর সাথে চাকমাদের পরিবার কাঠামোর বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। তাদের পরিবারের কর্তা হলেন পুরুষ। পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য লক্ষণীয়। পুরুষই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

বংশধারা পিতার বংশ অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়। পরিবারের কর্তা পুরুষ হলেও তাদের পরিবার ব্যবস্থায় মেয়েদেরকেও সমান প্রাধান্য দেওয়া হয়। তারা মেয়েদের অবহেলা করেন না। এ কারণেই তাদের সম্পত্তিতে ছেলেমেয়ে সমানভাবে ভাগ পায়। অর্থাৎ তাদের পরিবার ব্যবস্থা পিতৃসূত্রীয় তবে এখানে মেয়েদেরও সমান অধিকার প্রদান করা হয়।

৪. জীবিকা নির্বাহ: রাখাইনরা মূলত কৃষিনির্ভর। নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে তারা নানা জাতের ধান, ডাল, পিঁয়াজ, আলু, কুমড়া, তিল, তরমুজ ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করে। এর পাশাপাশি তারা হস্তচালিত তাঁতে বোনা বস্ত্র, লবণ, মসলা এবং গুড়ও তৈরি করে। তারা নানা ধরনের তরিতরকারিও উৎপাদন করে। বর্তমানে তারা এর দ্বারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যও পূরণ করছে।

রাখাইন মহিলারা গবাদি পশুপালনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসায়িক কাজেও নিয়োজিত। তবে বর্তমানে কোটা পদ্ধতির বদৌলতে রাখাইনদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সফল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন চাকরিজীবী।

রাখাইন

রাখাইনদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা

রাখাইনরা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ব্যাপারে অত্যন্ত রক্ষণশীল। তাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয় আলোচনা করা হবে সেগুলো নিম্নরূপ-

১. খাদ্যাভ্যাস: রাখাইনদের প্রধান খাবার হলো ভাত। এর পাশাপাশি তারা মাছ, ডাল এবং শাকসবজি খেয়ে থাকে। শূকরের মাংস ও শুঁটকি তাদের প্রিয় খাবার। উৎসবের সময় তারা বিভিন্ন ধরনের পিঠাও বানায়।

২. পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা: রাখাইনদের পোশাক-পরিচ্ছদে যথেষ্ট বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। রাখাইন পুরুষরা পোশাক হিসেবে লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে। আবার বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে অনুষ্ঠানে তারা পাগড়িও পরে। তারা আবার জ্যাকেট জাতীয় এক ধরনের পোশাকও পরে। আর মেয়েরা নিজেদের সূচি করা লুঙ্গি পরে এবং এর ওপর তারা ব্লাউজ পরে। মেয়েরা হাতে, পায়ে, কানে, গলায় ও কোমরে সোনা-রুপার গয়নাও পরে থাকে। রাখাইন মেয়েরা খুব সৌন্দর্য সচেতন। কেবল মেয়েরা নয়, ছেলেরাও হয়। তারা এক ধরনের উপটান ব্যবহার করে যাকে বলা হয় 'তাখোদা'। ছেলেমেয়ে সবাই এ উপটান ব্যবহার করে। এতে তাদের চেহারার উজ্জ্বলতা ও লাবণ্য বাড়ে।

রাখাইন

৩. বাড়িঘরের ধরন: রাখাইনদের বাড়িঘর নির্মাণের কৌশল একটু ভিন্ন ধরনের। তারা যখন উপকূলীয় এলাকায় বসবাস শুরু করে তখন তা ছিল অরণ্যভূমি। হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল তাদের বসবাসরত স্থান। বাঘ, বন্য মহিষ, গরু, বিষধর সাপ, ডাঙ্গায় আর জলে কুমির। তবু তারা অনেক কষ্টে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায় গাছপালা কেটে, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে নিজেদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য আবাদি জমি তৈরি করে। হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে বাঁচতে তারা উঁচু মাচা তৈরি করে ঘর বানাত। বাড়ির চারপাশে বেড়া দিয়ে রাখত। সমস্ত এলাকা ১০/১২ হাত উঁচু সুন্দরি কাঠ দিয়ে, প্রাচীর বানিয়ে রাখত। বাড়ির সামনে কোনো উঠান ছিল না। তাদের বাড়িগুলো খুব সুসজ্জিত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

৪. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি রাখাইনরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্যাপন করে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনরা গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালন করে। এছাড়াও তারা বসন্ত উৎসব, বৈশাখী পূর্ণিমা, মাঘীপূর্ণিমা ইত্যাদি উৎসবও পালন করে থাকে। তাদের বাৎসরিক শ্রেষ্ঠ উৎসব হলো সাংগ্রাই। এটি চৈত্র মাসের শেষ দুদিন এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দিন এ তিন দিনব্যাপী তারা উদ্যাপন করে। মৈত্রী পানি বর্ষণ এ উৎসবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি 'পানি খেলা' নামেও পরিচিত। এছাড়াও তারা 'কঠিন চীবর দান' অনুষ্ঠানও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে পালন করে থাকে।

রাখাইন

৫. শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থা: রাখাইন শিশুরা তাদের শিক্ষা জীবন শুরু করে 'সিয়াং' বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আশ্রমে। তারা সেখান থেকে ধর্মীয় ও ভাষাগত উভয় শিক্ষাই গ্রহণ করে। রাখাইনদের সমাজে ধর্মীয় শিষ্টাচার পালনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় সেবাব্রত পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত।

৬. রাখাইনদের ভাষা: রাখাইন ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ একটি ভাষা। এটি ভোট-বর্মী/তিব্বতি-বর্মী ভাষাগোষ্ঠী থেকে এসেছে। এটি মূলত মারমা ভাষার উপভাষা। রাখাইনদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। রাখাইন বর্ণমালায় স্বরবর্ণকে বলা হয় 'ছারা' এবং ব্যঞ্জনবর্ণকে বলা হয় 'ব্যেঃ'। তাদের ভাষায় স্বরবর্ণ ১২টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩টি। রাখাইন ভাষায় একমাত্র গবেষক হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী মনিরুজ্জামান। তিনি রাখাইন ভাষার দুটি প্রধান উপভাষা বা ভাষিক বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন। একটি হলো 'র‍্যামরা' এবং অন্যটি 'মারৌত্ত'। মারমা এবং রাখাইন উভয় গোত্রই বর্মী লিপি ব্যবহার করে।

বাংলাদেশের কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বসবাস, নরগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা

রাখাইন

৭.রাখাইনদের ধর্ম: রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা বৌদ্ধধর্মের সকল নিয়মকানুন, যেমন- সর্বপাপ বর্জন, কুশল-কর্মাদি অনুষ্ঠান, চিত্তের নির্মলতা সাধন, নির্বাণ লাভ ইত্যাদি বিষয়ে প্রচণ্ড বিশ্বাসী। তবে তারা আদিবাসীদের মতো অতিপ্রাকৃত শক্তি, জাদুবিদ্যা ইত্যাদিতেও বিশ্বাসী। এছাড়াও তারা জড়বাদ তথা ভবিষ্যৎ কর্মের ফলাফল নির্ণয়, ভাগ্যে চরম বিশ্বাস এবং জড়বাদে অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করে।

৮. রাখাইনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: রাখাইন সমাজে কেউ মারা গেলে তাকে স্নান করানোর পর নতুন কাপড় পরিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। মৃত্যুর পর মৃতদেহকে চিতায় দাহ করা হয়। এরপর ছাই বা অবশিষ্টাংশ মাটিতে পুঁতে রেখে সেখানে বাঁশ পোঁতা হয় এবং মাথায় কাপড়ের নিশান ওড়ানো হয়। মৃত্যুর সাত দিন পর তারা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪– বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা

টপিক – ০৪ এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

টপিক ০৩: এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটিভাবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করে। যাদের একটি নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে এবং যারা অন্য নৃগোষ্ঠী থেকে নিজেদের আলাদা মনে করে। বাংলাদেশে প্রায় ৫৭টিরও অধিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো হলো- চাকমা, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরি, খাসিয়া, মগ, কোচ ও রাখাইন।

> নাপ্পি

নাপ্পি বলতে এক ধরনের শুঁটকি গুঁড়া বা পেস্টকে বোঝায়। এ খাবারটি তৈরি করা হয় চিংড়ি এবং অন্যান্য ছোট মাছের শুঁটকির সাথে মরিচ দিয়ে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের কাছে খুব জনপ্রিয় একটি খাবার হলো নাপ্পি।

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> বিজু

বিজু হলো চাকমা নৃগোষ্ঠীদের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান। চাকমারা বিজু উৎসব পালন করে তিন দিন ব্যাপী। চৈত্রের শেষ দুই দিন ও বৈশাখের প্রথম দিন বিজু উৎসব পালন করা হয়। বিজু উৎসব আবার তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম দিন ফুল বিজু উৎসব, দ্বিতীয় দিন মূল বিজু উৎসব এবং সর্বশেষ তৃতীয় দিন গোর্জাপোর্জা উৎসব পালন করা হয়। ফুল বিজুর দিন ঘর পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে নদীতে ফুল ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মূল বিজু হলো সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ও উৎসবমুখর দিন। ওইদিন ঐতিহ্যবাহী নানা রকম পিঠা-পুলি ও পানীয়ের আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ গোর্জাপোর্জা উৎসবের দিন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজু উৎসব শেষ হয়। এছাড়াও আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে জলবিজু উৎসব পালন করে চাকমারা।

> পিনোন-খাদি

চাকমা নারীদের ঐতিহ্যবাদী পোশাক হলো পিনোন-খাদি। চাকমা নারীরা লাল-কালো স্ট্রাইপের নিম্নাঙ্গে স্কার্টের মতো পরে তাকে পিনোন বলে এবং বক্ষে ব্লাউজের উপর যে কাপড় পরে তাকে খাদি বলে। পিনোনের একদিকে বিভিন্ন নকশা করা আঁচল থাকে যেটিকে চাবুগি বলা হয়। চাবুগি বাঁদিকে পরে রমণীরা যেন হাঁটার সময় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> মান্দি

মান্দি হলো গারোদের স্থানীয় ভাষার নাম। মান্দি ভাষাকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- আচিক কুসিক ও মান্দি কুসিক। মান্দি বা গারো ভাষার চর্চা মূলত কথ্যরূপেই সীমাবদ্ধ। এদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। আচিক কুসিকের পাশাপাশি গারোরা তিনটি প্রধান কথ্যভাষাও ব্যবহার করে। যথা- আবেং, আত্তং ও মেগাম।

> মাহারি

মাহারি বলতে গারোদের বিভিন্ন দল, গোত্র ও উপগোত্রকে বোঝায়। গারোরা তাদের ভাষায় মাহারি বলতে বংশকে বোঝায়। মাহারি হলো একই বংশের লোক।

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> দকমান্দা ও দকশারি

দকমান্দা ও দকশারি হলো গারো নারীদের ঐতিহ্যবাদী পোশাক। দকমান্দা নামে গারোরা বিশেষ এ কাপড় নিজেরা বুনে।

➢ সাংসারেক

সাংসারেক হলো গারোদের ঐতিহ্যবাদী আদি ধর্ম। সংসার শব্দ থেকে সাংসারেক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। জগৎ সংসার বোঝাতেই সাংসারেক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। গারোদের ধর্ম মূলত জগৎকেন্দ্রিক তারা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী।

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> বৈসাবি

বৈসাবি হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের একটি উৎসবের নাম। ত্রিপুরার বৈসু, মারমাদের সাংগ্রাই এবং চাকমাদের বিজু থেকে এ বৈসাবি নামের উৎপত্তি। এ উৎসব পালন করা হয় চৈত্র মাসের শেষ দুই দিন এবং বৈশাখের প্রথম দিন। ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমা এ তিন সম্প্রদায় এক সাথে বৈসাবি উৎসব পালন করে।

> কঠিন চীবর দান

কঠিন চীবর দান হলো চাকমাদের ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসব প্রতিবছর অক্টোবর মাসের শেষে বা নভেম্বর মাসের শুরুতে বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার রাজবন বিহারে 'কঠিন চীবর দান' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে চাকমারা কঠিন চীবর দান করে। এ উৎসবের কার্যক্রম হলো তুলা থেকে সুতা তৈরি করে তাতে গেরুয়া রং করে কোমর, তাঁতে কাপড় বুনে ধর্মীয় রীতি অনুসারে কাপড় টুকরা টুকরা করে সেলাই করার পর তা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দান করার রীতিকে কঠিন চীবর দান বলা হয়। এ কার্যক্রম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়।

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> ওয়ানগালা

ওয়ানগালা হলো গারোদের সর্বশেষ ও সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান জুম চাষকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়। জুম চাষের সকল ফসল ঘরে তোলার আনন্দে অক্টোবর মাসের শেষে অথবা নভেম্বর মাসের প্রথমে গারোরা ওয়ানগালা উৎসব বিপুল জাঁকজমকভাবে উদ্যাপন করে। গারোরা ঐতিহ্যবাদী পোশাক ও অলংকার পরে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। এ উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরি 'চু পঁচুই' নামে এক প্রকার পানীয় যাকে মদ বলা হয়।

> সাতদিন্যা

চাকমাদের ধর্মীয় রীতি মোতাবেক মৃত ব্যক্তির সাতদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে সাতদিন্যা অনুষ্ঠান বলে। মৃত পরিবারের জন্য শোককাল সাতদিন স্থায়ী হয়। এ সময় চাকমারা মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে খাদ্য, অর্থ, কাপড় ইত্যাদি উৎসর্গ করে। মৃত ব্যক্তির পরিবার এ সাতদিন মাছ, মাংস খেতে পারে না।

এই অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> নোকনা

গারোদের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা মাতৃসূত্রে বর্তায়। উত্তরাধিকার হিসেবে গারো পরিবারের ছোট মেয়েকে নির্বাচিত করা হয়। যাকে গারো ভাষায় নোকনা বলা হয়। নোকনা অর্থ হলো পরিবারের ভিত্তি। নোকনার দায়িত্ব হলো বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবা-যত্ন করা এবং মৃত্যুর পর তাদের সৎকার করা।

> মানযহি বা মাঝি

সাঁওতালদের গ্রামপ্রধানকে মানযহি বা মাঝি বলা হয়। মাঝির একজন সহকারী থাকে। সহকারীর নির্দেশে গ্রামের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পাদিত হয়।

> সোহরায়

সাঁওতালদের সবচেয়ে বড় ঐতিহ্যবাদী বার্ষিক উৎসব হলো সোহরায়। পৌষ-মাঘ মাসে নতুন ফসল ঘরে তোলার পর গৃহ দেবতা, গোত্রদেবতা ও পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ উৎসবে তারা ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে আল্পনা আঁকে। ছয়দিনব্যাপী এ উৎসবের আনন্দ থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪– বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা

টপিক – ০৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ১ রমা ও শ্যামা দুই বন্ধু। রমা বাংলাদেশের সিলেট জেলায় বসবাসরত এমন একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য, যাদের জীবনে নৃত্যের গুরুত্ব অনেক। তারা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী সৃষ্টির পিছনেও এ নৃত্যের ভূমিকা রয়েছে। অপরদিকে, শ্যামা বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে বসবাসরত যে নৃগোষ্ঠীর সদস্য, তাদের আদি অস্ট্রেলীয় বলা হয়। এরা সাতটি গোত্রে বিভক্ত। এদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও আলাদা কোনো বর্ণমালা নেই।

ক. বাংলাদেশের বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী কোনটি?

খ. জুম চাষ-ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রমার নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত শ্যামার নৃগোষ্ঠীগত স্বতন্ত্রতা রয়েছে"-ব্যাখ্যা কর।

[ঢা. বো. '২৩; রা. বো. '২৩; ব. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ২ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পার্থিবের নতুন বন্ধু 'ক' বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য। এদের সমাজের প্রশাসনিক কাঠামো আদাম, মৌজা, সার্কেল এরূপ স্তরে বিভক্ত। * প্রত্যেক স্তরে একজন প্রধান ব্যক্তি কর্তৃত্ব করেন। রাজা ঐ সমাজের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। পার্থিবের অন্য আর একজন বন্ধু 'খ' অপর একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য যার বসবাস বৃহত্তর ময়মনসিংহে। এদের সমাজ মায়ের কর্তৃত্বে পরিচালিত এবং তাদের ভাষার নাম মান্দি।

ক. আদামের প্রধানকে কী বলা হয়?

খ. এথনিক গোষ্ঠী বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পার্থিবের বন্ধু 'ক'-এর জীবনধারা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পার্থিবের বন্ধু 'ক' ও 'খ'-এর জীবনধারার বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর।

[রা. বো. '২২; চ. বো. '২২: সি. বো. '২২; ব. বো. '২২; দি. বো. '২২; ম. বো. '২২]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ৫ তামীম দুটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা পাঠ করে নিচের ছকটি তৈরি করে :

নৃগোষ্ঠী-১	রাজশাহী অঞ্চলে বাস	বহির্গোত্র বিবাহ প্রচলিত	সম্পত্তি পিতা থেকে পুত্র পায়	প্রধান উৎসব সোহরাই
নৃগোষ্ঠী-২	ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাস	প্যারালাল কাজিন বিবাহ নিষিদ্ধ	সম্পত্তি মাতা থেকে কন্যা পায়	প্রধান উৎসব ওয়ানগালা

ক. জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী কোনটি?

খ. জুম চাষ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের নৃগোষ্ঠী-১-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

ঘ. "নৃগোষ্ঠী-২-এর জীবনধারা ও বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্নতা রয়েছে"- মূল্যায়ন কর।

[ঢা. বো. '২১; য. বো. '২১; ফু. বো. '২১; চ. বো. '২১; সি. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪– বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা

টপিক – ০৫ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. নৃগোষ্ঠীর সর্বাধিক স্বীকৃত ইংরেজি পরিভাষা কী?

ক. Race
খ. Special Community
গ. Hilltract Community
ঘ. Jipsy

২. 'নৃগোষ্ঠী হচ্ছে মানবজাতির একটি প্রধান বিভাগ যার রয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায় এমন নির্দিষ্ট দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলি'- উক্তিটি কার?

ক. টেইলর
খ. টি এইচ গ্রিন
গ. ম্যাকাইভার
ঘ. রবার্ট গ্রিন

৩. নৃগোষ্ঠী স্বতন্ত্র কেন? [সকল বোর্ড '২১]

ক. এদের ধর্ম এক
খ. এদের সংস্কৃতি ভিন্ন
গ. তাদের একই পূর্বপুরুষ
ঘ. তাদের ভাষা অভিন্ন

৪. ক্ষুদ্র জাতি সত্তার রয়েছে- [সকল বোর্ড '২৩]

ক. পৃথক দৈহিক বৈশিষ্ট্য
খ. ভাষা বিনিময়ের একই মাধ্যম
গ. পৃথক রাষ্ট্র
ঘ. পৃথক খাদ্যাভাস

৫. নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য কোনটি? [সকল বোর্ড '১৯]

ক. বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ন্যায় ভাষা
খ. ধর্ম, নরবংশে আলাদা
গ. স্বজাত্যবোধের অনুপস্থিতি
ঘ. ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. ককেশয়েড নরগোষ্ঠী বেশি পরিলক্ষিত হয়-

ক. যুক্তরাজ্যে খ. ভারতে গ. বাংলাদেশে ঘ. জাপানে

৭."বাঙালিরা মঙ্গোলয়েড-দ্রাবিড় প্রভাবিত শংকর জনগোষ্ঠীর এ অভিমত হলো-

ক. নীহারঞ্জন রায়ের খ. প্রফেসর এমাজ উদ্দীনের

গ. রিজলের ঘ. মার্কস ও লেলিন-এর

৮.উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী বংশে অর্জিত হয়-

i. নাকের গড়ন ii. মুখাকৃতি iii. চুলের রং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৯. ক্ষুদ্র জাতিসত্তার রয়েছে-

i. পৃথক রাষ্ট্র ii. ভাব বিনিময়ের আলাদা মাধ্যম iii. পৃথক দৈহিক বৈশিষ্ট্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও i iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শাকিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছে। নবীনবরণ অনুষ্ঠানের দিন দুজন বন্ধুর সাথে তার পরিচয় হয়। যাদের গায়ের রং বাদামি ও চুলের গড়ন সোজা ও খাড়া।

[সকল বোর্ড '১৫]

১০. শাকিলের নতুন বন্ধুরা কোন নৃগোষ্ঠীর সদস্য?

ক. ককেশয়েড খ. মঙ্গোলয়েড গ. নিগ্রোয়েড ঘ. অস্ট্রালয়েড

১১. উক্ত নৃগোষ্ঠীর লোকদের বৈশিষ্ট্য যে এথনিক সম্প্রদায়ে দেখা যায় তা হলো-

i. সাঁওতাল ii. মণিপুরি iii. গারো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১২. চাংমেং > চাংমে চাংমা > চাকমা-এভাবে চাকমা শব্দের উৎপত্তি হওয়ার তথ্য দিয়েছেন-

ক. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

খ. আব্দুল আউয়াল ঠাকুর

গ. আব্দুল আউয়াল মিয়াজি

ঘ. আব্দুল আউয়াল জিহাদি

১৩. 'চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. রাজা অশোক

খ. অশোক কুমার পাল

গ. অশোক কুমার দেওয়ান

ঘ. অশোক ঘোষ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১৪. চাকমারা বসবাস করে-
ক. চাঁদপুরে খ. যশোরে গ. চট্টগ্রামে ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রামে
১৫. কাদের গায়ের রং ফর্সা, নাক চ্যাপ্টা এবং চোখ ছোট?
ক. চাকমা খ. খাসিয়া গ. সাঁওতাল ঘ. ওঁরাও
১৬. ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে কারা সর্ববৃহৎ দল?
ক. চাকমা খ. খাসিয়া গ. সাঁওতাল ঘ. ওঁরাও
১৭. চাকমাদের পরিবার কোন কেমন?
ক. মাতৃতান্ত্রিক খ. পিতৃতান্ত্রিক গ. মাতৃ-পিতৃতান্ত্রিক ঘ. গণতান্ত্রিক

THANK YOU